উৎস মানুষ

৩৩ বর্ষ ● ৩য় সংখ্যা ● জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৩

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আমাদের কথা		
প্রাকৃতিক দুর্যোগ	সমীরকুমার ঘোষ	২
উন্নয়ন চাই	অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়	৫
শরীরচর্চার কথা	গৌতম মিস্ত্রি	৮
জাগো, গ্রাহক	মুকুল বিশ্বাস	১৬
স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার অসুখ-বিসুখ	সঞ্জীবকুমার মুখোপাধ্যায়	২০
সাক্ষরতা ও শিক্ষা	বিবেক সেন	২১
পুস্তক পর্যালোচনা	অরুণ পাল	২৪
মেয়েরা ভাল নেই	অজানা চৌধুরী	২৫
অনামিকা তুমি অপরাজিতা	পূরবী ঘোষ	২৮
হারিয়ে যাচ্ছে ঐতিহ্যের ধান	নিজামুল হক	২৯
চিঠিপত্র		৩১
সংগঠন সংবাদ		৩২

সম্পাদক - সমীরকুমার ঘোষ

রেজিস্টার্ড অফিস - বি ডি ৪৯৪
সল্টলেক, কলকাতা-৬৪

কার্যালয়
খাদিমস বিদ্যাকুট আবাসন
বি ৪ ও ৫, এস-৩, নারায়ণপুর
পোঃ (আর) গোপালপুর কলকাতা-৭০০১৩৬
ফোন:
৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/৯৮৩১৪৬১৪৬৫
ওয়েবসাইট : www.utsamanush.com
ই-মেল- utsamanush1980@gmail.com

ধর্ষণ: তলিয়ে ভাবা দরকার

সাম্প্রতিক সবচেয়ে আলোড়নকারী সামাজিক ঘটনাটি ঘটেছে বারাসতের কামদুনিতে। একটি মেয়েকে ধর্ষণের পর খুন করা হয়েছে নৃশংসতায়। ধর্ষণ যে রাজ্যে এই প্রথম ঘটল এমন নয়। কিন্তু এ ঘটনাটি জনমানসে প্রবল আলোড়ন ফেলেছে। বুদ্ধিজীবী ওরফে বিদ্বজ্জন ওরফে সুশীল সমাজও থাকতে না পেরে পথে নেমেছেন। শোকে-ক্রোধে মোমবাতি জ্বালানো হচ্ছে, মিছিলও। এত সবের পরেও তো প্রতিদিন কাগজে-টিভিতে ধর্ষণের খবর। কে কত অল্পবয়সী ধর্ষণ করতে পারে, তা নিয়ে যেন প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গিয়েছে! ধর্ষিতার পরিবার ও পড়শীদের জোরালো দাবি— ফাঁসি। কিন্তু তাতেই কি সুরাহা? এর আগে আমরা দেখেছি মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রী এবং কয়েকজনের আবদারে একরকম জোর করেই ধনঞ্জয়ের ফাঁসি হয়েছে। সে ঘটনা ছিল কাগজ-টিভির প্রধান খাদ্য। ফাঁসি যদি দৃষ্টান্ত হয়, তাহলে তো আর ধর্ষণ হওয়ার কথা নয়! মোমবাতি-মিছিলে লোডশেডিং কমে যাওয়ায় মুখ থুবড়ে পড়া মোমবাতি-ব্যবসা চাঙ্গা হতে পারে, ধর্ষণ কমে কি?

শুধু পশ্চিমবঙ্গ, বিশেষত বারাসতই ধর্ষণীয় স্থান হয়ে উঠেছে এমন নয়। এইডসের মতো এটিও আন্তর্জাতিকতা লাভ করেছে। পশ্চিমী তথাকথিত উন্নত দেশ বা কমিউনিস্ট চীন— কেউই বাদ নেই! প্রতিকার নিয়ে আলোচনায় প্রথমেই কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হচ্ছে পোশাককে। বছর দুয়েক আগে টরেন্টো পুলিশের এক কর্তা অপরাধ-দমন সংক্রান্ত এক অনুষ্ঠানে ধর্ষণ প্রসঙ্গে বলে ফেলেছিলেন, 'মহিলাদের যৌনকর্মীদের মতো পোশাকআশাক এড়িয়ে যাওয়া উচিত।' প্রতিবাদে গোটা নারীসমাজ রে রে করে ওঠে। কদিন আগেও কলকাতায় 'স্লাট ওয়াক' হয়ে গিয়েছে। এক সাংবাদিক আগুপিছু না জেনে পোস্টার, শরীর-লিখন দেখে 'যৌনকর্মীদের মিছিল' লিখে ফেলায় কাগজকে ক্ষমা চাইতে হয়েছে। তা সত্ত্বেও সম্প্রতি বেজিং পুলিশ মেয়েদের বাসে-সাবওয়েতে মিনি স্কার্ট বা হট প্যান্ট জাতীয় পোশাক পরে চলাফেরা না করতে পরামর্শ দিয়েছে। মেয়েদের পোশাকি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ নয়, পুরুষদের সংযত হতে হবে— এটা প্রায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। এ সব নিয়ে তর্ক, আলোচনা চলুক।

যৌনতা এখন নিছক প্রজাতি সংরক্ষণের উপায় নয়, মজার খেলা; সেরা বিনোদন, সেরা বিপণন সম্ভারও। ইন্টারনেটে ইউটিউবে অযুত উপকরণ। ফোকটাই দেখো, যতখুশি। মোবাইলে ভরে নাও। বন্ধুরা চালাচালি করো। অফুরান মস্তি। প্রেমিকরা প্রাক্-বিবাহপর্বের যৌন-বিনোদনের দৃশ্য ধরে রাখছে মোবাইল-ক্যামেরায়। ইচ্ছা-অনিচ্ছায় তা ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র। মাথা থেকে গুরুভার হালকা করতে সংসদে বসে দামড়া মন্ত্রী-সাংসদরাও মোবাইলে পর্নোগ্রাফি দেখছেন! ইদানীং সিনেমায় আইটেম নাচ না থাকলে জমছে না। 'শীলা কি জওয়ানি', 'মুন্নি বদনাম হুই', 'ফেভিকল সে' জাতীয় গান যুবসমাজের দিল কি ধড়কন বাড়াচ্ছে। বিয়েবাড়িতে, পাড়ার

প্রতিমা-বিসর্জনে ডিজে-চালিত এই গানের সঙ্গে উদ্দাম নাচে ছেলেদের সঙ্গে টক্কর দিচ্ছে মেয়েরা। জাপানি 'রেপ গেম' অল্পবয়সীদের প্রিয় খেলা হয়ে উঠেছে। মা ও তাঁর দুই মেয়েকে পিছু ধাওয়া করে ধর্ষণ— এটাই খেলা! সংবাদপত্র বাড়ির সবার পাঠ্য। তার বিনোদন পাতায় বিবসনা সুন্দরীরা আলো করে থাকছে। পাতাটি কে তারিয়ে উপভোগ করবে, তাই নিয়ে বাবা-ছেলে লুকোচুরি খেলা চলে। মেয়েদের টেনিস দিনে দিনে দারুণ জনপ্রিয় হচ্ছে!

চারপাশ থেকে ক্রমাগত যৌন সুড়সুড়ি, তার সঙ্গে সঙ্গত করছে সুলভ মাদক, এর কি কোনো প্রভাব নেই? বিদ্বজ্জন, মনোবিদ, সমাজতাত্ত্বিকরা যখন এ নিয়ে মাথা ঘামানোর ফুরসত পাবেন, হয়ত বলতে পারেন। আপাতত ছেলেদের সংযত হতে হবে, যৌন তাড়নায় লাগাম পরাতে হবে, পরামর্শ আসছে। কীভাবে? বিবেকানন্দের পদ্ধতিতে? কিন্তু সবাই তো স্বামীজি নয়!

ধর্ষণ নামক গুরুতর সামাজিক ব্যাধির কারণ কি তলিয়ে দেখার সময় এখনও আসে নি? ফাঁসি বা প্রতিবাদ মিছিলে এই ব্যাধি নির্মূল হবে— কেউ এমন ভাবলে ভাবুন। গোড়া-কাটা গাছের আগায় জল দিয়ে যদি গাছ বাঁচে, তার চেয়ে সুখের কী আছে! প্রতিবাদ-প্রতিরোধ, গণতান্ত্রিক আন্দোলন তো থাকবেই। তবে কাগজ-টিভির লাগাতার উস্কানি, সেই সঙ্গে ধর্ষণকারীর মুণ্ডু চাই মার্কা গণ-আন্দোলনে একটা শঙ্কাও হচ্ছে, সামাজিক হিস্টিরিয়া না তৈরি হয়। ছেলেধরার গুজবের মতো সত্যি-মিথ্যে না জেনেই প্রশাসনে, আইনে আস্থা-হারানো জনগণের গণশাস্তি যখন নেমে আসবে, বেঘোরে কত প্রাণ যাবে কে জানে!

দুর্যোগ প্রাকৃতিক দান বিপর্যয় তৈরি মানুষের

সমীরকুমার ঘোষ

উত্তরাখণ্ডের পরিবেশ-ধ্বংসের জন্য অনেকেই দায়ী করছেন শিল্পায়নকে। নতুন রাজ্য গঠনের পরই শিল্পগঠনের দেদার ছাড়পত্র দেওয়া হয় হৃষীকেশ ও হরিদ্বারে। সরকার করেও অনেক ছাড় দেয়। ফলে গত এক দশকে প্রচুর শিল্প গড়ে ওঠে, বিশেষ করে ওষুধ শিল্প। এই অঞ্চলে প্রকৃতি নষ্ট করে বেশি জনবসতি গঠন করলে শুদ্ধতা নষ্ট করবে, অনেকদিন আগেই সতর্ক করেছিলেন জিম করবেট, তাঁর 'মাই ইন্ডিয়া' বইতে। তাঁর ভবিষ্যৎবাণী মিলে গেল। পরিবেশবিদরা একবাক্যেই বলছেন— দুর্যোগ প্রাকৃতিক, বিপর্যয় মানুষের তৈরি (অ্যানথ্রোপোজেনিক)।

পৃথিবীতে সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী কে?—মানুষ। সবচেয়ে নির্বোধ?— তাও মানুষ। যে মানুষ মহাশূন্যে মানুষ পাঠায়, গগনচুম্বী অট্টালিকা তৈরি করে, একটা ছোট্ট যন্ত্রে কথা-ছবি পাঠিয়ে দেয় পৃথিবীর আরেক প্রান্তে, পরমাণু ভেঙে এমন বোমা বানায় যা নিমেষে লক্ষ মানুষকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে— সেই মানুষকে সবচেয়ে নির্বোধ প্রাণী আখ্যা দিলে অনেকেই রে রে করে তেড়ে আসতে পারেন। কলার চেপে ধরে শুধোতে পারেন, কোন যুক্তিতে মানুষ শুয়োর বা শুঁয়োপোকার চেয়েও নির্বোধ? এর এক কথায় উত্তর— প্রকৃতির বিরুদ্ধাচারণে। তাবৎ প্রাণী প্রকৃতিরই সৃষ্টি। তাই সব প্রাণীই প্রকৃতির নিয়ম মেনে চলে। নির্বোধ মানুষ নিজেকে অতি-বুদ্ধিমান ভাবে, প্রকৃতির সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে চায়, এমনকি

প্রাকৃতিক কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটাতেও ছাড়ে না। বাঁধ দিয়ে নদীর গতি রোধ করে, গাছপালা কেটে নগরের পত্তন করে। কল-কারখানা করে বাতাস-জল বিষিয়ে দেয়— তারপর এগিয়ে যাওয়ার আনন্দে মশগুল থাকে। প্রকৃতিকে আমরা অনেকেই মা বলি, সেই মা যেন অলক্ষ্যে মিটিমিটি হাসেন। কৃষ্ণের মতো মানব-শিশুপালের একশো অপরাধ ক্ষমা করেন। তারপর উচিত শিক্ষা দেন। মানুষ মূর্খ, ফল দেখে তখনকার মতো সম্বিৎ ফেরে। আবার যে কে সেই! সাম্প্রতিক কালে উত্তরাখণ্ডের 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' তারই উজ্জ্বল উদাহরণ। ঠিক কত জীবনহানি হয়েছে, তা আদৌ জানা যাবে না। সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হিসেব করার চেষ্টা হতে পারে। কিন্তু কেন এমন হল? ভক্ত বলতে পারেন--- ঈশ্বরের অভিশাপ! সাধারণ মানুষ দোষ দেবেন প্রকৃতিকে। পাহাড়ের মতন সংবেদনশীল অঞ্চলে ধস, মেঘ-ভাঙা বৃষ্টি বা হড়কা বান নতুন কিছু নয়। কিন্তু এবারের মতো এত বড় ক্ষয়ক্ষতি স্মরণাতীত কালের মধ্যে হয় নি। পরিবেশবিদরা মাঝে মাঝেই ক্ষীণ কণ্ঠে সতর্ক করার চেষ্টা করেন। সুন্দরলাল বহুগুণা বহু আগেই পাহাড়ি অঞ্চল থেকে নির্বিচারে গাছ কাটতে বারণ করেছিলেন। কে ওসব ছেঁদো কথায় কান দেয়! উন্নয়ন, হাজার মানুষের রুজি-রোজগার, রাজ্যের রাজস্ব আদায় আগে, না, পরিবেশ-ভাবনা! তরতর করে এগিয়ে গিয়েছে 'সভ্যতা'। ধর্মপ্রাণ মানুষের বাসভূমি ভারত। ইতস্তত ছড়িয়ে আছে মন্দির, ধাম, যেখানে গ্যাঁট হয়ে বসে আছেন শিব, হরি, কালী, তিরুপতি, জগন্নাথরা। ভক্তরা গিয়ে পায়ে আছড়ে পড়লেই হল। প্রণামির বিনিময়ে পাপক্ষালন। ভক্ত তুলসীদাস অনেক কাল আগে আক্ষেপ করে বলেছিলেন —'কস্তুরী মৃগ নিজের সুগন্ধের তাড়নায় সারা বন ঘুরে মরে, যা কিনা রয়েছে নিজেরই নাভিতে, তেমনই প্রত্যেকের হৃদয়েই রাম অধিষ্ঠান করছেন, দুনিয়া তা দেখতে পায় না। চারদিকে খোঁজ করে।' ভক্তরা তুলসীদাসের কথা শুনলে ভক্তি-ব্যবসা লাটে উঠত! প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ তীর্থযাত্রী কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ —বাবার দুই থানে পুণ্যার্জনে যানে। তাদের থাকা-খাওয়ার সুবন্দোবস্ত দরকার। তার জন্য চাই হোটেল, পান্থশালা। বিদেশী ভক্তদের জন্য চাই রিজর্ট, স্পা। কোথায় হবে? কেন পাহাড়ের গায়েই! ঝপাঝপ বড় বড় গাছ কেটে সাফ। শুধু হোটেল-লজ হলেই চলবে না, প্রচুর বিদ্যুৎ চাই। 'নদী আপন বেগে পাগল পারা' জাতীয় গান মণ্ডপে, বৈঠকখানায় বাজুক, ওখানে চলবে না। কারণ জলবিদ্যুৎ তৈরি করতে হবে। বাঁধ দিয়ে নদীকে ইচ্ছামতো আটকানো হল। জলবিদ্যুতের জন্য নদীকে খরস্রোতা হতে হয়। নদী গভীর হলে স্রোত কমে যায়। তাই বড় বড় বোল্ডার ফেলে কমিয়ে ফেলা হল নদীর গভীরতা। ব্যস আর কি চাই!

কেদারের পিছনদিকে গান্ধী সরোবর। খানিকটা জল ধরে রেখে বিপর্যয় কিছুটা ঠেকাতে পারত। পারে নি। কারণ পুণ্যার্থী ও পিকনিক পার্টির ফেলা আবর্জনায় তা পূর্ণ হয়েছিল! সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টের অধিকর্তা সুনীতা নারায়ণ জানিয়েছেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ আছে---নদীর কিনার থেকে ২০০ মিটার ছেড়ে নির্মাণ করতে হবে। সেই আদেশকে কাঁচকলা দেখিয়ে নদীর ঘাড়ের ওপরেই গড়ে উঠেছে হোটেল, রিজর্ট। না হলে পর্যটকদের চোখের আরাম হবে কী করে! সকালে নদীর কলধ্বনিতে ঘুম যদি না ভাঙল, তবে কেদার গিয়ে লাভ কী! পাহাড়ি নদীর অববাহিকায় গজিয়ে-ওঠা যথেচ্ছ বাড়িঘরকে ফুঁসে-ওঠা নদী ধুয়ে সাফ করে দিয়েছে।

অনেক ধ্বংসের মধ্যে প্রচুর ক্ষতি হলেও জেগে আছে কেদারনাথের মন্দির। দেব-মহিমা প্রচার করে পরে আরও খদ্দের টানবে ধর্ম-ব্যবসায়ীরা। কিন্তু ঘটনা হল, গড়িয়ে আসা কিছু বোল্ডার আটকে গিয়েছিল মন্দিরের এক পাশে। তার জন্য ঘুরে যায় স্রোতের অভিমুখ।

উত্তরাখণ্ডে দেদার বেআইনি নির্মাণ, নির্বিচারে গাছ কাটা, সেই সঙ্গে ডায়নামাইট দিয়ে বিস্ফোরণের ফল যে ভাল হবে না, তা নিয়ে অনেক আগেই সতর্ক করেছিল 'ক্যাগ', মানে কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল। দার্জিলিঙের জেলাশাসক সৌমিত্র মোহন, একই ধরনের আশঙ্কা করছেন দার্জিলিঙের ক্ষেত্রে। ১৯৮০ সালেই আলাদা রাজ্যের দাবি তুলে গাছ কেটে ফাঁক করে দেওয়া হয়েছিল। পাহাড় হিসেবে হিমালয় সবার চেয়ে উঁচু হতে পারে, কিন্তু বয়সে নবীন। আল্পস দিয়ে গাড়ি চলার পথ তৈরি হতে পারে, এখানে তা করা সম্ভব নয়। পাহাড়ের নীচের মাটি এখনও তত পোক্ত হয়ে ওঠে নি।

২০১২-র ১৮ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রক ১৯৮৬-র পরিবেশ সংরক্ষণ আইনের উল্লেখ করে ভাগীরথী সহ

গোমুখ এবং উত্তরকাশীর মধ্যেকার ১৩৫ কিলোমিটার অঞ্চলকে ইকো-সেনসিটিভ জোন বা পরিবেশ-সংবেদী অঞ্চল বলে ঘোষণা করেছিল। তার মানে ওখানে কোনো ধরনের নির্মাণকাজ করা যাবে না। উত্তরাখণ্ড সরকার এর তীব্র প্রতিবাদ করে। তাদের দাবি ছিল— তাহলে তো উন্নয়নই থমকে যাবে! পরিবেশ দপ্তরের বিজ্ঞপ্তি মানলে ১৭৪৩ মেগাওয়াটের জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এবং সেই সঙ্গে খনিজ-উত্তোলন এবং যাবতীয় হোটেল-রিজর্ট নির্মাণ বন্ধ করে দিতে হত। বাস্তবে কী ঘটল? ২০০০ সালে উত্তরাখণ্ড সরকার গঠনের পরই উন্নয়নের জোয়ার আনতে পাহাড়ে এন্তার ফাটতে লাগল ডায়নামাইট। অলকানন্দা, ভাগীরথী ও মন্দাকিনীর ওপর গত কয়েক বছরে গড়ে উঠেছে ৭০টি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। উত্তরাখণ্ডের গর্বিত মুখ্যমন্ত্রী বিজয় বহুগুণার (আক্ষরিক অর্থেই বহু 'গুণ'-এর অধিকারী) গর্বিত দাবি, '২০১৬-র মধ্যে তাঁর রাজ্যে বিদুৎ উদ্বৃত্ত হবে।' সুড়ঙ্গ, রাস্তা, বিদ্যুৎ প্রকল্প যত বেড়েছে তত আলগা হয়েছে পাথরের ভিত। এদিকে ২০১১-র জনগণনার হিসাবে উত্তরাখণ্ডের জনসংখ্যা ছিল ১ কোটি ৮ লক্ষ। আর ওই বছরেই পর্যটক-পুণ্যার্থী এসেছে মাত্র আড়াই কোটি। মানে দ্বিগুণেরও বেশি। এগুলো মাথা মুড়িয়ে দু পয়সা না কামালে রাজ্য এগোবে কী করে! এগিয়ে গেলও। যেমন বাসের কন্ডাক্টররা বলেন, দাদা পিছনের দিকে এগিয়ে যান।'

জিওলজিক্যাল সার্ভে অভ ইন্ডিয়ার প্রাক্তন ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল ভি কে রায়না বলেছেন, ক্লাউড বার্স্ট বা ফ্যাশ ফ্লাড তো প্রাকৃতিক ব্যাপার, একে আটকানো যায় না। তবে নদী-তীরবর্তী নির্মাণগুলো নিয়ম মেনে করলে এমন ভয়াবহ পরিণতি ঘটত না। তিনি পরিষ্কারই জানিয়েছেন, 'উত্তরাখণ্ডের এই নির্মাণকাজ আদৌ নিয়ম মেনে হয় নি। যারা এগুলো করিয়েছে, তারা প্রাথমিকভাবে হিসাবি ঝুঁকি নিয়েছে। এখন তার মূল্য দিতে হল।'

সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টের সুনীতা নারায়ণের বক্তব্য, এই ধরনের ভঙ্গুর অঞ্চলে যে কোনো নির্মাণই পুরোপুরি নিষিদ্ধ করে দেওয়া উচিত। প্রকৃতিকে ধ্বংস না করেই আমাদের উন্নয়ন-পরিকল্পনা করা উচিত। সুনীতা স্পষ্টতই এই বিপর্যয়কে 'ম্যান-মেড ডিজাস্টার' বলেছেন।

চীনের কুনমিংয়ের অ্যাকাডেমি অভ সায়েন্সেস এবং দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় হিমালয় অঞ্চলে পরিকল্পিত বাঁধ (ড্যাম) নিয়ে সমীক্ষা চালিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল —'ড্যাম তৈরি ও আনুষঙ্গিক কাজের জন্য ১৭০০ বর্গকিলোমিটার অরণ্য জলের তলায় চলে যাবে অথবা ধ্বংস হবে।' এসব নিয়মনীতিকে ম্যানেজ করে নিয়ে, পরিবেশ দপ্তরের অপদার্থতার সুযোগে পাওয়া ছাড়পত্রে এই মহাসঙ্কট তৈরি হল, বলেছেন পরিবেশবিদ গোপালকৃষ্ণ।

এত কিছুর পরেও আমাদের শিক্ষা হবে না, তা জোর দিয়েই বলা যায়। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর কথাবার্তাই তার প্রমাণ। এমনটি না হলে মানুষকে সবচেয়ে নির্বোধ প্রাণীর শিরোপা দেওয়া হবে কী করে। নির্বুদ্ধিতার এমন অজস্র নমুনা চারদিকে ছড়িয়ে। বিপদ ঘটলে তারপর সেগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া আলোচনা হবে। আপাতত সেদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকাই শ্রেয়।

প্রতি বছর রাজ্যে বন্যা হয়। উৎস মানুষের এক আলোচনায় তুষার কাঞ্জিলাল বলেছিলেন, 'নদী মানুষের কাছে আসে না। মানুষই নদীর কাছে যায়।' নদী কূল ভাঙবে, নতুন কূল গড়বে প্রাকৃতিক নিয়মেই। তাকে সেই জায়গা দিতে হবে। তার ঘাড়ের ওপর আস্তানা গেড়ে, তাকে বাঁধ দিয়ে রোখা মূর্খতার নামান্তর। কিন্তু কী করা যাবে, উন্নয়ন বড় বালাই!

প্রসঙ্গত আরেকটি তথ্য পেশ করা যাক— সাম্প্রতিক জনগণনা ও এনএসএসও ডেটা থেকে জানা যাচ্ছে— সারা দেশে দ্রুত হারে কমছে কৃষিকাজ-করা মানুষের সংখ্যা। গত ১০ বছরে প্রায় ৯০ লক্ষ কৃষক হাওয়া। খাদ্যসুরক্ষা কমে যাওয়া, অন্য পেশায় বেশি লাভ, ১০০ দিনের কাজ, গ্রাম-সড়ক যোজনায় খাটান দেওয়া ইত্যাদি অনেক কারণ আছে। কারণ যাই হোক বিষয়টা ভাববার।

পুন : প্রকৃতির বিরুদ্ধতা বা প্রকৃতির অভিশাপ নিয়ে কথা হচ্ছে, তাই একটা উদাহরণ পেশের লোভ সামলানো যাচ্ছে না। সদ্যপ্রয়াত চলচ্চিত্র পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষের অকালমৃত্যু। এর আগে প্রায় এমনটিই ঘটেছে মাইকেল জ্যাকসনের জীবনে।

উমা

আহরণ

উন্নয়ন চাই, কিন্তু কীসের বিনিময়ে

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

উন্নতির দায় অনেক। ইমারত যত উন্নত হয়, পাখি হারিয়ে ফেলে তার চেনা আকাশ। কারখানা যত ছড়িয়ে পড়ে, বাতাসে ততই বেড়ে ওঠে বিষবাষ্প। কীভাবে নিরসন হবে এই দ্বন্দ্বের, প্রশ্ন সেটাই।

শীত এসে চলে গেল, তবু ওরা এবারে এলো না। ওরা মানে সেই যাযাবর অতিথিরা, যারা প্রতি বছর শীতের উজ্জ্বল রোদে ডানা ঝাপটে কলকাকলিতে ভরিয়ে রাখে গোটা আলিপুর চিড়িয়াখানা। পক্ষীপ্রেমী আর কিছু বিশেষজ্ঞ সখেদে আঙুল তুলে দেখিয়েছেন লাগোয়া 'তাজ বেঙ্গল' হোটেলের উত্তুঙ্গ ইমারতকে। তাঁরা বলছেন পাঁচতারার জৌলুসে ঝলসানো প্রকৃতি আমাদের প্রিয় শীতের তারকাদের সামান্য উষ্ণতাটুকু আর উপহার দিতে পারেনি, তাই ...।

যাক্। গোটা কয়েক পাখি না হয় না-ই এলো, কিন্তু ওরকম আন্তর্জাতিক মানের একটা হোটেল তো হল, যেখানে বিদেশি মুদ্রা পায়ে হেঁটে আসে। ...তা বটে। তবু কোথাও এক সূক্ষ্ম ব্যথার সুর বাজে। বিশেষ করে সনাতন গুছাইত-এর মতো যাদের অতি-আধুনিক সল্টলেকে উপনগরী সব কেড়ে নিয়েছে, বাপ-ঠাকুর্দার মৎস্যচাষের পেশা থেকে উচ্ছেদ হতে হয়েছে, ছিন্ন হয়েছে যাদের মহিষবাথান বা সংলগ্ন এলাকার মাছের ভেড়ির প্রতি নাড়ির সংযোগ শুধু নগর উন্নয়নের মাসুল দিতে, তারা বড় বেশি করে বোঝে জলের মাছ, ঘাসের ফড়িং, গাছের পাখি আর নির্ভেজাল বাতাস হারিয়ে যাওয়ার যন্ত্রণা। সনাতনের মতো বহু ছিন্নমূল প্রতিবেশী আজ অন্য পেশায়, সল্টলেকের ভেতর 'স্বপ্ননীড়' বা 'সুখের ভিলা' গড়ে তোলার কাজে দিনমজুর। ভার তুলতে কুকড়ে যায় ফুসফুস। তারা শুধু অসহায় চোখে নতুন নতুন ইমারতের দেয়াল জরিপ করে এক টুকরো চেনা আকাশের খোঁজে।

এ-ও যাক। উন্নত নতুনের জন্য পুরাতনকে তো সরে যেতেই হয়। আন্তন চেকভ তো বিশ্বসাহিত্যে 'চেরি আর্চার্ড'-কে সেভাবেই দেখিয়েছেন। আমরাও দেখি কত নতুনের উদ্ধত অভ্যুত্থান। কিন্তু তবু থেকে থেকে আপত্তি ওঠে। ন্যায়-অন্যায় উচিত-অনুচিত নিয়ে মাথা ঘামায় আজকের মানুষ, বৃহত্তর জনতা। এখানে ওখানে সংগঠিত মানুষ বৃহৎ উন্নয়নের কর্মযজ্ঞে আপত্তি জানায়, প্রতিবাদ করে। পরিবেশ প্রকৃতি রক্ষার কথা বলে আপন অস্তিত্বের স্বার্থে। বিশ্বের নানা প্রান্তেই এই নতুন প্রশ্ন নতুন মাত্রা পাচ্ছে। আধুনিক ভারতের গোটা প্রেক্ষাপটেই চোখে পড়ছে এরকম প্রতিবাদ প্রতিরোধ।

হাতের কাছে আনকোরা উদাহরণ হল **তেহরি-বাঁধ**। উত্তর প্রদেশের গাড়োয়াল পাহাড়ের তেহরিতে নদী বেঁধে অত্যাধুনিক বাঁধের নতুন প্রকল্প, নতুনতর সম্ভাবনার সরকারি ঘোষণা কিন্তু অগুনতি সোজা-সরল গাড়োয়ালি মানুষ বলছে— এ বাঁধ আমরা চাই না, আমরা ধ্বংস হতে চাই না। প্রশান্ত গাড়োয়াল পাহাড় আজ প্রতিরোধ আন্দোলনে অশান্ত।

বিচ্ছিন্ন কোনও নিদর্শন এটা নয়। স্বাধীন ভারতবর্ষের বিগত কয়েক দশকের উন্নয়ন প্রকল্পগুলির কয়েকটির দিকে একটু অনুসন্ধানী দৃষ্টি ফেললেই নজরে আসবে উদ্ভাসিত প্রকল্প-প্রদীপগুলির তলদেশের অন্ধকার।

মৌন উপত্যকা : কেরলের পালঘাটে অনবদ্য এক প্রাকৃতিক সম্পদ সমৃদ্ধ উপত্যকায় ১২০ মেগাওয়াট জল বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ শুরু হয় সত্তরের দশকে। কেরল শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদ, বাম-ডান রাজনৈতিক দল ও বিজ্ঞান কর্মীরা আন্দোলনে সামিল হয় নির্মাণ বন্ধ করতে। ব্যাপক অরণ্য ধ্বংস হয়ে দুর্লভ প্রাণিকুল বিনাশ হওয়া ছাড়াও এলাকার বৃষ্টিপাত ভীষণভাবে কমে যাওয়ার ভয় ছিল। আপাতত প্রকল্পের কাজ ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছে আন্দোলনকারীরা।

সার কারখানা : সুন্দরবন অঞ্চলের লক্ষ্মীকান্তপুর-এর মন্দিরবাজারে বসতে চলেছে সার কারখানা। কারখানার সালফিউরিক অ্যাসিড, ফসফেট চূর্ণ জল-বাতাস দূষিত করবে, ধ্বংস করবে উর্বর চাষ জমি। মাছের চাষ নষ্ট করবে। গ্রামকে গ্রাম আরও দারিদ্রে ডুববে।

নর্মদা বন্ধন : নর্মদা নদীর ওপর দুটো বাঁধ হবে। গুজরাতে সর্দার সরোবর আর মধ্যপ্রদেশে ইন্দিরা সাগর। এই দুই সু-উন্নত বাঁধ লক্ষ লক্ষ হেক্টার বনভূমি আর চাষের জমি ডুবিয়ে দেবে। দুষ্প্রাপ্য প্রাণী আর উদ্ভিদ নিশ্চিহ্ন হবে অকাতরে। ৫০০ গ্রাম ভেসে যাবে। ঘরবাড়ি হারাবে ১০ লক্ষের বেশি মানুষ। নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন চলছে।

বালিয়াপাল ঘাঁটি : ওড়িশার বালিয়াপাল ভোগরাই তহশিলে জাতীয় পরমাণু ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি নির্মাণ প্রতিরোধে মরণপণ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে হাজার গ্রামবাসী ১৯৮৪ থেকে। রণসজ্জার অঙ্গ এই ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটির জন্য ১০ হাজারের বেশি পরিবারকে উঠে যেতে হবে। পুনর্বাসন অনিশ্চিত। উৎখাত হবে ২০ হাজার মৎস্যজীবী। ২ লক্ষ নারকেল গাছ কাটা পড়বে। অত্যন্ত উর্বর ধানচাষের জমি শেষ হবে। উচ্চমানের পানের বরোজ নষ্ট হয়ে ক্ষতি হবে বার্ষিক ৩৫ কোটি টাকা।

সুবর্ণ রেখা বাঁধ : বিহারের সিংভূমে সুবর্ণ রেখাকে বাঁধা হচ্ছে সেচ ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে। ১২ হাজার আদিবাসী পরিবার ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হবে। ১০ হাজার হেক্টার ঘন বনাঞ্চল ও ২৫০ গ্রাম জলের নীচে চলে যাবে। এতে যা সেচ ও বিদ্যুতের সুবিধা হবে, তা ভোগ করবে শহুরে শিল্পাঞ্চলের মানুষ। আদিবাসীদের চূড়ান্ত বঞ্চনার বিনিময়ে। তীব্র প্রতিরোধ সংগ্রামের সময় ১৯৮২-তে আদিবাসী নেতা গঙ্গারাম কালুণ্ডিয়াকে হত্যা করে বিহার পুলিশ।

নারোরা চুল্লি: উত্তরপ্রদেশের নারোরায় দু' জোড়া পরমাণু শক্তি চুল্লি বসানোর কাজ অনেকদূর এগিয়েছে। অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় বহু বিশেষজ্ঞের আপত্তি অগ্রাহ্য করে বসছে এই চুল্লি। বিদ্যুতের বরাভয় কোন্ ছার, তেজস্ক্রিয় বিকিরণের আতঙ্ক এলাকার মানুষের নিদ্রা হরণ করেছে। বাড়তি বিপদ হল, নারোরা একটি ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল। লাগাতার গণ-প্রতিবাদ চলছে ওখানে।

কাইগা, কাকরাপার: কাইগা পরমাণু চুল্লি নির্মাণ যজ্ঞ সম্পূর্ণ গ্রাস করবে কর্ণাটকের অত্যন্ত সমৃদ্ধ পশ্চিমঘাট অরণ্য। ...সুরাতের কাকরাপার খুবই ভূমিকম্প-প্রবণ। অথচ এখানেই বসছে ৪৭০ মেগাওয়াট পরমাণু চুল্লি। সঙ্গে প্লুটোনিয়াম পরিশোধন প্ল্যান্ট-এর পরিকল্পনাও রয়েছে। এই প্লুটোনিয়াম মৌলটি দিয়ে অনায়াসে তৈরি হয় পরমাণু অস্ত্র।

এরকম উদাহরণ রয়েছে বিস্তর। সত্যিই কি এগুলিকে উন্নয়ন বলা যাবে? ভারত কল্যাণরাষ্ট্র বলে ঘোষিত। কিন্তু উন্নয়নের নামে দেশবাসীর এক বিরাট অংশ যদি প্রকৃতির দেওয়া নির্মল জল-মাটি-বৃক্ষ-বাতাস আর বাস্তুজমি থেকে বঞ্চিত হয়, তা হলে কোন কল্যাণ সাধিত হবে? সরকারি হিসেবেই এ দেশে দারিদ্র্য-সীমার নীচে জনসংখ্যা বাড়তে বাড়তে দাঁড়িয়েছে ২১ কোটি (বেসরকারি হিসেবে এ সংখ্যা নিশ্চয় অনেক বেশি হবে)। তা হলে উন্নয়ন প্রকল্পগুলি এতদিন ধরে কার উন্নতি ঘটালো? সহজ উত্তর মনে আসে— মুষ্টিমেয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর আর আধুনিক নগর শিল্পাঞ্চলের মানুষের। যেমন, তেহরি বাঁধ শহর-গ্রাম ভাসাবে, কিন্তু দিল্লির লোডশেডিং কমাবে। সুবর্ণরেখার ক্যানালের জল চলে যাবে জামশেদপুর ঘাটশিলা মুসাবনির বৃহৎ কারখানায়। এইসব অসন্তোষ আর দ্বন্দ্বগুলিই আজ মানুষের চেতনাকে নাড়া দিচ্ছে, অঙ্কুরিত করে দিচ্ছে বিক্ষোভ আন্দোলনের বীজ।

এ প্রসঙ্গে 'গ্রিন'-এর নাম এসে যায় সবার আগে। পশ্চিম জার্মানিতে আত্মপ্রকাশ করে গ্রিন পার্টি ষাট দশকের শেষ থেকে নতুন এক মতাদর্শ গোটা ইউরোপ জুড়ে বিকশিত করেছিল। সবুজ প্রাণের নবীন আশ্বাস। গ্রিন মুভমেন্ট-এর গোড়ার কথাই হল মানুষ-প্রকৃতি-সমাজ ও বিজ্ঞানচেতনার সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি।

আধুনিক বিশ্বের সর্বত্রই উন্নয়ন কার্যক্রমে, নতুন শিল্পায়নে, নিরাপত্তা আর পরিবেশরক্ষার জন্য নানা আইন-কানুন চালু করা হচ্ছে। ভারতেও বেশ কিছু প্রতিকারমূলক আইন রয়েছে, কিন্তু এখানে বিধিনিষেধ বড়ই ঠুনকো, ফাঁক-ফোঁকরে ভর্তি। উন্নত দেশগুলোতে তা নয়। ও দেশে নিরাপত্তা আর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কড়াকড়ির ঠেলায় অনেক প্রযুক্তিই চট করে বাতিল হয়ে যায়।

মার্কামারা কোনও ডান-বাম শিবিরের লাইন নয়। গত দশকে ইউরোপে এক বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে গ্রিন পার্টির দৃপ্ত আত্মপ্রতিষ্ঠার পর বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের পরিবেশবাদী দলগুলিতে এক নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়েছে। সেই 'সবুজ' মতাদর্শ আমাদের দেশেও সরাসরি আমদানি হয়ে আসেনি ঠিকই, তবে এ দেশের সাম্প্রতিক পরিবেশ আন্দোলনের চরিত্রে সেই সবুজ বাতাসের আভাস পাওয়া যায়। এতে কায়েমি ব্যবস্থার প্রবক্তারা কিছু বিব্রত বোধ করে। তারা আন্দোলন সংগঠকদের প্রগতিবিরোধী, সংকীর্ণ, স্বার্থান্বেষী বলে অভিহিত করার চেষ্টা করেছে। অবশ্য এহেন অসার অভিযোগ বিশেষ হালে পানি পায়নি, কেননা সর্বত্রই আন্দোলনকারীরা পেয়েছে আঞ্চলিক মানুষের সমর্থন, পরিবেশ-বিশেষজ্ঞদের সমর্থন, আর সর্বোপরি বিজ্ঞানের সমর্থন। স্বার্থ চরিতার্থের সুযোগ বরং তাদেরই রয়েছে, যাদের হাতে প্রকল্পের কোটি কোটি টাকার পুঁজি বিনিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণের ভার আছে। এ ছাড়া প্রত্যক্ষ স্বার্থ জড়িত বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগকারীদের।

আধুনিক বিশ্বের সর্বত্রই উন্নয়ন কার্যক্রমে, নতুন শিল্পায়নে,

নিরাপত্তা আর পরিবেশরক্ষার জন্য নানা আইন-কানুন চালু করা হচ্ছে। ভারতেও বেশ কিছু প্রতিকারমূলক আইন রয়েছে, কিন্তু এখানে বিধিনিষেধ বড়ই ঠুনকো, ফাঁক-ফোঁকরে ভর্তি। উন্নত দেশগুলোতে তা নয়। ও দেশে নিরাপত্তা আর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কড়াকড়ির ঠেলায় অনেক প্রযুক্তিই চট করে বাতিল হয়ে যায়। এ ছাড়াও পুরনো, প্রতিযোগিতায় অপারগ, খুঁত-সম্পন্ন বাতিল প্রযুক্তি ও কৃৎকৌশল তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে চালিয়ে দেওয়ার রেওয়াজ বেশ পাকাপোক্তই হয়ে গেছে। নজির আছে বিস্তর। কেবল বড় বাঁধের ক্ষেত্রেই নয়, কৃষি, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, ওষুধ শিল্প, মহাকাশ গবেষণা (রোহিনী কিংবা ইনস্যাট নিয়ে আমাদের জাতীয় গৌরব কতখানি 'মেকি' আর বিদেশ-নির্ভর তা ওয়াকিবহাল ভারতবাসী ভালই জানেন), পরমাণু শক্তিকেন্দ্র —সর্বত্র বাইরের বাতিল প্রযুক্তি দু হাত বাড়িয়ে নিয়েছে এ দেশের কর্ণধারেরা। এর মধ্যে পরমাণুচুল্লি আমদানির বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ভারত সরকার পরমাণু শক্তি শিল্পের প্রতি এখনও মোহগ্রস্ত। 'শান্তির জন্য পরমাণু'— এই প্রচারিত ধারণাটি বৈজ্ঞানিক মহলে যতই মিথ্যা ও ধাপ্পা বলে প্রমাণিত হোক না কেন, রাজনৈতিক কর্তারা তা সহজে মানেন না। তাই নিউক্লিয় পরমাণুচুল্লি থেকে অনায়াসে বোমা তৈরির আশঙ্কা আর ভয়াবহ পরিবেশ দূষণের কথা জেনেও ভারত সরকার পরমাণুবিদ্যুৎ দিয়ে আগামী শতাব্দীতে শক্তি সংকট সমাধানের সিদ্ধান্ত সদর্পে ঘোষণা করে। অথচ অন্যদিকে বৃহৎ দেশগুলো একে একে পরমাণু শক্তিশিল্প গুটিয়ে আনছে। বিগত দশকে মার্কিন দেশে থ্রি মাইল দ্বীপ আর রুশ দেশে চের্নোবিল দুর্ঘটনার পর একটিও চুল্লি তারা নিজের দেশে বসায় নি। কিন্তু পুরনো চুল্লিগুলোর গতি কী হবে? অতএব বাজার ধরার দৌড়। ভারতের দিকে তীক্ষ্ম চোখ রয়েছে রাশিয়ার।

কিন্তু সেই মূল প্রশ্নটার কী হবে! ...উন্নয়ন কি তা হলে বন্ধ হবে? দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির স্তব্ধ হবে? একথা তো সত্যি যে, মানুষের স্বার্থে যেমন প্রকৃতিরক্ষা অবশ্য কর্তব্য, তেমনি প্রকৃতির কাছে মানুষ-ই সর্বোত্তম সম্পদ। সেই মানবসমাজের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে যাওয়া প্রকৃতি-বিরোধী এক অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি নয় কি? সবচেয়ে বড় কথা কোনও উন্নতিশীল দেশে কোনভাবে 'উন্নয়ন'কে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করানো আদৌ কি কাম্য হতে পারে? পারে না। মানবসমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হল অবিরত উন্নয়নের প্রয়াস সর্বস্তরে।

কাজেই প্রার্থিত উন্নয়নের সঠিক রূপায়ণ হল আসল কথা। আধুনিক বিজ্ঞানের ফসল কার স্বার্থে কীভাবে কোথায় প্রযুক্ত হচ্ছে, তা নির্ধারিত হয় দেশের শাসককুলের নীতি অর্থাৎ রাজনীতির চরিত্র অনুসারে। প্রযুক্তি যদি দূষণকারী অনুপযোগী হয়, তাহলে তাকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমেই শুধরে পাল্টে নিতে হয়, উদ্ভব ঘটাতে হয় বিকল্প প্রযুক্তির। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখি উপযুক্ত নির্দোষ বিকল্প প্রযুক্তি থাকা সত্ত্বেও সেই ক্ষতিকারক জনবিরোধী প্রযুক্তিই ব্যবহৃত হচ্ছে, মুষ্টিমেয়ের স্বার্থে। সুতরাং দোষটা বিজ্ঞান-প্রযুক্তির নয়, দোষ তার প্রয়োগের, তথা অপপ্রয়োগের। অর্থাৎ প্রকারান্তরে দেশের আর্থ-রাজনৈতিক ব্যবস্থাটাই আসলে দায়ী। বর্তমান অবস্থাটা কেমন? রাষ্ট্রশক্তি চায় না প্রয়োগ ক্ষমতা বিকেন্দ্রীভূত হোক, জনগণের নিয়ন্ত্রণের এতটুকু সুযোগ থাকুক। বিদেশি লগ্নিকারীরা চায় না, দেশ বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে স্বনির্ভর হোক, প্রযুক্তির চাবিকাঠি তাদের হাতছাড়া হোক। দেশের বিজ্ঞান গবেষণার নীতি নির্ধারকরা চায় না, উপযুক্ত কোনও বিকল্প প্রযুক্তি সত্যিসত্যিই বিকশিত হোক। গত বছরের হিসেবে দেখা যায় সরকার পরমাণু শক্তি খাতে ব্যয় করছে ৫০০ কোটি টাকা অথচ সৌরশক্তি বা অনুরূপ দূষণমুক্ত বিকল্প গবেষণায় বরাদ্দ ব্যয় মাত্র ৭ কোটি টাকা।

সুতরাং চলতি সমাজ-কাঠামোয় হবে না। প্রকৃত উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত বিকল্প প্রযুক্তির প্রয়োগ চাইলে দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থারও বিকল্প প্রয়োজন। সেই বিকল্প ব্যবস্থায় আঞ্চলিক মানুষের প্রকৃত গণতান্ত্রিক ভূমিকা থাকবে। মানুষ-পরিবেশ-প্রকৃতি ও বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত প্রাধান্য পাবে। স্বনির্ভরতার প্রচেষ্টা উৎসাহিত হবে। অর্থনীতি হবে প্রকৃত অর্থে সমাজতান্ত্রিক। আর ক্ষমতা বিকেন্দ্রীভূত হবে। কেবল তখনই উন্নয়নকে আমরা শত বিকশিত ফুলের অর্ঘ্যে বরণ করে নিতে পারব।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৮ মার্চ ১৯৯০-এ প্রকাশিত

উৎস মানুষ পত্রিকা ও বই পেতে যোগাযোগ করুন

দীপক কুণ্ডু

২৯/৩ শ্রী গোপাল মল্লিক লেন

কলকাতা - ৭০০০১২

(কর্পোরেশন অফিসের পাশের গলি)

ফোন নং - ৯৮৩০২৩৩৯৫৫

শরীরচর্চাই শেষ কথা?

গৌতম মিস্ত্রি

শ্যামলবাবু আমার অনেক দিনের পরিচিত। সম্প্রতি উনি প্রাণায়ামের বিস্তর উপকারিতা সম্পর্কে জেনেছেন এবং জোরকদমে শুরুও করে দিয়েছেন। বেশ কিছুদিন এই অভ্যাস করতেই দেখা যায় তিনি বেশ গায়েগতরে হচ্ছেন। প্রাণায়ামের উপকারিতার তালিকায় তো মোটা হওয়ার কথা নেই! তাহলে? সেটার অনুসন্ধান করতে গিয়েই প্রাণায়াম, প্রাতঃভ্রমণ এবং শরীরচর্চার সাতসতেরো সামনে এসে গেল। বিষয়টা একটু খটমট ঠেকতে পারে। কিন্তু জেনে রাখাটা খুব দরকার। চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের শরীরচর্চা সম্পর্কিত পরামর্শ জেনে নিয়ে বয়স ও স্বাস্থ্যের অবস্থা অনুযায়ী শরীরচর্চার জন্য বরাদ্দ আপনার মূল্যবান সময়ের সদ্ব্যবহার করুন।

শ্যামলবাবু আমার বহু পুরানো রুগী, উচ্চরক্তচাপ আর ডায়াবেটিস রোগে ভুগছিলেন। হঠাৎ মোটা হতে শুরু করলেন। বছরে এক দুবার চিকিৎসা বিষয়ে পরামর্শের জন্য আসতেন, কারণ এমনিতে তাঁর কোনও শারীরিক অসুবিধা ছিল না। প্রথমে আপাতদৃষ্টিতে মোটা হওয়ার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া গেল না। অধিকাংশ সুস্থ অথবা অসুস্থ মানুষের ক্ষেত্রে মোটা হওয়ার বাহ্যিক কোনো কারণ পাওয়া যায়। কেউ হয়তো দু'চাকার গাড়ি কিনেছে, কেউ চাকরির সুবাদে ঘরছাড়া আর আগেকার নিয়ন্ত্রিত খ্যাদ্যাভ্যাস বর্জন করতে বাধ্য হয়েছে, আবার কারোর ক্ষেত্রে হাঁটুতে বাতে ব্যথার জন্য প্রাতঃভ্রমণ বন্ধ করতে হয়েছে। শ্যামলবাবুর ক্ষেত্রে তেমন কিছুই ঘটে নি। খেয়াল হল, কোনো এক অজ্ঞাত কারণে বিগত কয়েক বছরে মোটা হওয়া লোকের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। হতভাগ্য সেই লোকগুলোর ক্রমশ কলেবর বৃদ্ধির কোনও কারণ নির্ণয় করতে পারছিলাম না। আতসকাচ নিয়ে গোয়েন্দাগিরিতে নামব এমনটা যখন ভাবছি, তখন একটা বিশেষ ও সাধারণ ঘটনা সেইসব আপাত বিনা কারণে মোটা হওয়া লোকের মধ্যে খুঁজে পেলাম।

অন্য সব সদ্য মোটা হওয়া মানুষের মতো আমার পুরনো রুগীটিও মহা উৎসাহে প্রাণায়াম নামে এক ধরনের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। প্রাণায়াম, যোগব্যায়াম ও এই ধরনের ব্যায়ামে শরীরের ওজন বাড়ে এই কষ্টকল্পনা কেউ করবেন না। মুশকিল হচ্ছে, আমার রুগীটি সেটা করেছেন তাঁর দৈনন্দিনের কর্মতালিকা থেকে প্রাতঃভ্রমণ ছাঁটাই করে। এই বিষয়ে আলোচনার তিনটি অধ্যায় আছে। প্রথমত অন্যান্য লোকের মতো আমার সেই রুগীটি হঠাৎ কেন প্রাণায়ামে আকৃষ্ট হলেন, দ্বিতীয়ত প্রাতঃভ্রমণ বন্ধ করে প্রাণায়াম অভ্যাস করলে ওজন বাড়ে কেন, তৃতীয়ত প্রাণায়ামের প্রচারের পিছনে কোনো স্বার্থান্বেষী শক্তি লুকিয়ে আছে কি?

ম্যাজিক আমাদের আকৃষ্ট করে :

শুধু মানুষ কেন মনুষ্যেতর প্রাণীরাও সংক্ষেপিত পথ বা শর্টকাট পছন্দ করে। ঘামঝরানো প্রাতঃভ্রমণ অথবা সমতুল্য দৌড়ঝাঁপের ব্যায়ামে (অ্যারোবিক এক্সারসাইজ) খাটুনি আছে। তার তুলনায় এক জায়গায় বসে বা দাঁড়িয়ে থেকে বিভিন্নভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়ার প্রক্রিয়াতে অনেক কম খাটুনি। এটা লক্ষণীয়, যোগব্যায়াম (পসচারস) ও প্রাণায়ামের (রেসপিরেটরি এক্সারসাইজ) মধ্যে প্রথমটিতে প্রশিক্ষণ ও শারীরিক দক্ষতার প্রয়োজন বেশি বলে সহজতর প্রাণায়াম পণ্য হিসাবে ব্যাপারিদের কাছে অধিক জনপ্রিয়। প্রাণায়াম খুব সহজেই প্রাতঃভ্রমণের শর্টকাট পরিবর্ত প্রক্রিয়া হিসাবে জনপ্রিয় হয়ে গেল। আমার রুগীটিও মহানন্দে প্রাতঃভ্রমণ বাদ দিয়ে প্রাণায়াম শুরু করে দিলেন, কারণ ইতিমধ্যে প্রাণায়ামের প্রবক্তারা সাধারণ মানুষের দুর্বল জায়গাগুলোতে সুড়সুড়ি দিতে শুরু করেছেন। বলছেন, প্রাণায়ামে মোটারা রোগা হবে, ডায়াবেটিসের রুগীদের সুগার কমবে, হাঁপানি রোগীর রোগ সেরে যাবে, উচ্চরক্তচাপের রুগীদের রক্তচাপ কমবে, এমন আরও অনেক বহু আকাঙ্খিত অধরা স্বপ্ন। কালো মেয়ের ফর্সা হওয়ার মলম, 'জাপানি তেল'-এর বিজ্ঞাপনদাতা আর এই স্বপ্নের ব্যাপারিদের উদ্দেশ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এই ধরনের অবৈজ্ঞানিক বিজ্ঞাপনের মধ্যে নবতম সংযোজন 'মর্নিং ওয়াকার' নামে পায়ে সুড়সুড়ি দেওয়া একটি অকাজের লোকঠকানো পণ্য, যেটা কারও সর্বনাশ করার পক্ষে খুবই উপযুক্ত।

আলোচনার সুবিধা ও অনুধাবনের ক্রম পরম্পরা রক্ষার জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ শরীরচর্চা বিজ্ঞানের আলোচনা প্রথমে সেরে নিয়ে পরে প্রাণায়াম সম্পর্কিত শ্যামলবাবুর সমস্যার সমাধান করা যাবে।

শরীরচর্চা করার প্রয়োজন কেন? : ১. নীরোগ ও সুস্থা থাকা অথবা নিরাময়ের অযোগ্য রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের অপেক্ষাকৃতভাবে বেশি কর্মক্ষম থাকা ও তাদের রোগের প্রকোপ হ্রাস করা। ২. মেদবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা। ৩. কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি। ৪. সুঠাম ও আকর্ষণীয় দেহের অধিকারী হওয়া।

শরীরচর্চা করে আমরা যে উপকারগুলো আশা করি তার

মধ্যে সবথেকে আবেদনময় হল সুঠাম ও আকর্ষণীয় দেহের অধিকারী হওয়া। শহরের বিত্তবানদের সেই প্রয়োজন মেটাতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত দামি পরিষেবা মূল্যের জিমনাসিয়ামের বা হাইপ্রোফাইল ক্লাবের অভাব নেই। জিমনাসিয়াম সংস্কৃতিতে আকর্ষণীয় দেহ প্রাপ্তি হলেও তাতে প্রয়োজনীয়তার নিরিখে বেশি দরকারি ও প্রথমে উল্লিখিত নীরোগ ও দীর্ঘজীবন প্রাপ্তি নিশ্চিত হয় না। কেবল পেশি ফোলানোর ব্যায়াম করলে সেটাও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে না। কর্মক্ষমতা বা চলতি ভাষায় 'দম' (ফিজিক্যাল ফিটনেস)-এর মাপকাঠি হল আপনার হৃদপিণ্ড-ফুসফুস-রক্তনালীর সংঘবদ্ধ ক্রিয়া পেশীতে একক সময়ে কত বেশি অক্সিজেনপূর্ণ রক্ত সরবরাহ করতে পারে ও পেশী একক পরিমাণ রক্ত থেকে আনুপাতিক ভাবে কত বেশি পরিমাণে অক্সিজেন সংগ্রহ করতে পারে। এটাকে পরিভাষায় ভিওটু ম্যাক্স বলে। এ বিষয়ে ঢোকার আগে শরীরচর্চা বিজ্ঞানের কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য জেনে নেওয়া যাক।

শরীরচর্চা বিজ্ঞান

মানুষের যে কোনও নড়াচড়ার জন্য মাংসপেশী (এর পরে সংক্ষেপে পেশী বলব) সংকোচন ও প্রসারণ দরকার। এর জন্য যে শক্তির প্রয়োজন সেটা মেটায় অ্যাডিনোসিন ট্রাই ফসফেট (এ টি পি) নামে এক যৌগ। পেশীর মধ্যকার গ্লুকোজ ও অক্সিজেনের বিক্রিয়ার ফলে অ্যাডিনোসিন ট্রাই ফসফেটের সাথে উৎপন্ন হয় কার্বন ডাই অক্সাইড ও জল। এই বিক্রিয়াকে অ্যারোবিক গ্লাইকোলিসিস বলে। দ্রুত ও শক্তিশালী পেশীর সংকোচন ও প্রসারণের জন্য পেশীর মধ্যে পর্যাপ্ত অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত পৌঁছানো জরুরি। অ্যাডিনোসিন ট্রাই ফসফেট তৈরির কাঁচামালের মধ্যে দ্বিতীয়টি অর্থাৎ গ্লুকোজের অভাব একদিন উপোস করলেও ঘটে না। পেশীর তন্তুতে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত পৌঁছনোর দায়িত্বে থাকা অঙ্গগুলি হল হৃদপিণ্ড, ফুসফুস, রক্তনালী ও পেশী (রক্ত থেকে পেশীর অক্সিজেন নিষ্কাশন ক্ষমতা)। যে কারণে নিয়মিত শরীরচর্চা করা ব্যক্তি অন্য এক সুস্থ কিন্তু অলস ব্যক্তির চেয়ে বেশি কর্মক্ষম। সেটাকে অর্কেস্ট্রার এবং বেসুরো আনাড়িদের বাদ্যযন্ত্র পেটানোর সঙ্গে তুলনা করা যায়। নিয়মিত শরীরচর্চা করা ব্যক্তির হৃদপিণ্ড ও ফুসফুসের কাজের যুগলবন্দি ঘটে, বাধাহীন সরবরাহের জন্য অনেক বেশি ও মোটা রক্তনালী তৈরি হয় আর একই পরিমাণ অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত থেকে পেশী অধিক পরিমাণে অক্সিজেন সংগ্রহ করতে পারে।

কোনো কোনো কাজে অতি অল্প সময়ে দ্রুত ও শক্তিশালী পেশীর সংকোচন ও প্রসারণ করার প্রয়োজন হয়, যেমন দৌড়ে ট্রেন ধরা অথবা দম বন্ধ করে ভারী কোনো বস্তু তোলা। এই সময়ে পর্যাপ্ত অক্সিজেনের অভাবে অক্সিজেন ছাড়াই অ্যানঅ্যারোবিক গ্লাইকোলিসিস প্রক্রিয়ায় অ্যাডিনোসিন ট্রাই ফসফেট তৈরি হয়। তবে এই প্রক্রিয়া বেশীক্ষণ চালানো যায় না। অভ্যাস-বহির্ভূত পরিশ্রমে ঘন ঘন শ্বাস নেওয়া শুরু হলে বুঝতে হবে অ্যানঅ্যারোবিক গ্লাইকোলিসিস শুরু হয়ে গেছে। ব্যক্তিবিশেষের পরিশ্রম করার এই মাত্রা তার শারীরিক দক্ষতার মাপকাঠি। একে অ্যানঅ্যারোবিক সীমা (থ্রেশহেল্ড) বলব। এক এক বারে এই প্রক্রিয়া ১০ থেকে ৩০ সেকেণ্ড স্থায়ী হয় ও অ্যারোবিক গ্লাইকোলিসিসের থেকে ১০০ গুণ অ্যাডিনোসিন ট্রাই ফসফেট তৈরি হয়। পরে অক্সিজেনের সঙ্গে ল্যাকটিক অ্যাসিড বিক্রিয়ায় যকৃতে কার্বন ডাই অক্সাইড, জল ও আরও অ্যাডিনোসিন ট্রাই ফসফেট তৈরি হয়।

অ্যারোবিক গ্লাইকোলিসিস : গ্লুকোজ + অক্সিজেন=কার্বন ডাই অক্সাইড + জল + অ্যাডিনোসিন ট্রাই ফসফেট

অ্যানাঅ্যারোবিক গ্লাইকোলিসিস : গ্লুকোজ=পাইরুভেট (->ল্যাকটিক অ্যাসিড) + অ্যাডিনোসিন ট্রাই ফসফেট

ভি ও টু ম্যাক্স : অক্সিজেন ব্যবহারের উর্ধ্বসীমা

বিশ্রামরত অবস্থায় একজন মাঝবয়সী মানুষ প্রতি মিনিটে ওজনের প্রতি গ্রামের জন্য ৩.৫ মিলিলিটার অক্সিজেন ব্যবহার করে। শারীরিক পরিশ্রম করার সঙ্গে সঙ্গে অধিক পরিমাণে মাংসপেশীর সংকোচ ও প্রসারণ হতে থাকে ও তার শক্তির প্রয়োজনও বাড়তে থাকে। ফলে ক্রমবর্ধমান শক্তির চাহিদা মেটানোর জন্য ক্রমবর্ধমান গ্লুকোজ ও অক্সিজেনের জোগানের প্রয়োজন হতে পড়ে। গ্লুকোজের জোগান অফুরান, কিন্তু হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, রক্তনালী ও রক্ত থেকে পেশীর অক্সিজেন আহরণ ক্ষমতার সম্মিলিত প্রচেষ্টা এক সময় তাদের ঊর্ধ্বসীমায় পৌঁছে যায়। চলতি ভাষায় বলা হয় 'দম ফুরিয়ে গেছে'। এই সময়, কেবলমাত্র অ্যারোবিক পদ্ধতিতে আর পর্যাপ্ত শক্তি (অ্যাডিনোসিন ট্রাই ফসফেট) তৈরি করা সম্ভব হয় না। তখন অ্যারোবিক ও অ্যানঅ্যারোবিক এই দুই পদ্ধতিতেই গ্লুকোজ থেকে অ্যাডিনোসিন ট্রাই ফসফেট তৈরি প্রক্রিয়া চলতে থাকে। যে কোনো ব্যক্তির অক্সিজেন ব্যবহারের ঊর্ধ্বসীমা (ভি ও টু ম্যাক্স) বলতে বোঝায় যে ঐ ব্যক্তির হৃৎপিণ্ড , ফুসফুস, রক্তনালী ও পেশীর গুণগত মানের সম্মিলিত ক্ষমতা কর্মরত মাংসপেশীতে সর্বাধিক কতখানি অক্সিজেন সরবরাহ করতে পারে। দেখা গেছে, এই সময় একজন সুস্থ কিন্তু নিয়মিত শরীরচর্চা না করা ব্যক্তি সর্বাধিক ৩৫ মিলিলিটার অক্সিজেন (বিশ্রামরত অবস্থায় দশগুণ) ব্যবহার করতে পারে। এর পরেও শারীরিক পরিশ্রম কষ্ট করে চালিয়ে গেলে শ্বাসকষ্ট হতে থাকে, ঘন ঘন শ্বাস নিতে হয় আর হৃৎস্পন্দনের গতি প্রচণ্ডভাবে বেড়ে যায়। এই সময় অ্যারোবিক গ্লাইকোলিসিসের পাশাপাশি স্বল্প সময়ের জন্য অক্সিজেন ছাড়াই অ্যানঅ্যারোবিক গ্লাইকোলিসিস পদ্ধতিতে গ্লুকোজ থেকে শক্তি (অ্যাডিনোসিন ট্রাই ফসফেট) তৈরি হয়। সর্বোচ্চ অক্সিজেন ব্যবহার করার এই ক্ষমতা ঐ ব্যক্তির ভি ও টু ম্যাক্স বা অক্সিজেন ব্যবহারের

ঊর্ধ্বসীমা। পরিশ্রমের যে সময় অক্সিজেন ছাড়া (অ্যানঅ্যারোবিক গ্লাইকোলিসিস পদ্ধতিতে) অ্যাডিনোসিন ট্রাই ফসফেট তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়, সেই সীমা (পরিশ্রমের) হল অ্যানঅ্যারোবিক থ্রেসহোল্ড বা অক্সিজেন বিহীন শক্তি তৈরির শুরুর সীমা। এই সময় বিনা অক্সিজেনে গ্লুকোজ থেকে অ্যাডিনোসিন ট্রাই ফসফেট তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ল্যাকটিক অ্যাসিড (ও তৎসম্পর্কিত হাইড্রোজেন আয়ন) তৈরি হয় যেটা পেশীতে ব্যথা উদ্রেক করে, পরিশ্রমরত ব্যক্তিকে ক্লান্ত করে তোলে, শ্বাস প্রশ্বাসের গতি প্রচণ্ড হারে বেড়ে যায়। তার পক্ষে আর পরিশ্রম চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না।

অ্যানঅ্যারোবিক থ্রেসহোল্ড : অক্সিজেন ব্যবহারের ঊর্ধ্বসীমা (ভি ও টু ম্যাক্স) যেমন কোনো ব্যক্তির পরিশ্রম করার ক্ষমতা নির্ধারণ করে, অ্যানঅ্যারোবিক থ্রেসহোল্ড নির্ধারণ করে দৈনন্দিনের কর্মকাণ্ডে কোন মাত্রা অবধি সেই পরিশ্রম স্বচ্ছন্দে করা যাবে। নিয়মিত শরীরচর্চা না করা ব্যক্তির অক্সিজেন ব্যবহারের ঊর্ধ্বসীমার ৭০ শতাংশ অতিক্রান্ত হবার পর অ্যানঅ্যারোবিক পদ্ধতির ডাক পড়ে শক্তি উৎপাদনের জন্য। পরিশ্রমের এই মাত্রাকে বলে অ্যানঅ্যারোবিক থ্রেসহোল্ড। নিয়মিত অ্যারোবিক ধরনের ব্যায়ামের দ্বারা সুস্থ ও বিশেষ ক্ষেত্রের কিছু রুগ্‌ণ ব্যক্তিদের অক্সিজেন ব্যবহারে ঊর্ধ্বসীমা বাড়ানো যায় এবং অ্যানঅ্যারোবিক থ্রেসহোল্ড ৭০ শতাংশ থেকে উচ্চতর শতাংশে বাড়ানো যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, নিয়মিত অ্যারোবিক ব্যায়ামের ফলে অনেক তীব্র মাত্রার শারীরিক পরিশ্রম করা সম্ভব হয় আর সেটা করা যায় অনেক স্বচ্ছন্দে।

শরীরের উপর শরীরচর্চার প্রভাব : এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, স্বচ্ছন্দে যে ধরনের ব্যায়াম বেশিক্ষণ ধরে করা যায় সেটা অ্যারোবিক ধরনের হতে বাধ্য। ক্রমবর্ধমান তীব্র মাত্রার ব্যায়ামের ফলে পেশীতে বেশি অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই অতিরিক্ত অক্সিজেন জোগানের জন্য মূলত দু'ধরনের পরিবর্তন ঘটে — ১) ক্রবর্ধমান গতিতে ক্রিয়াশীল হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস বেশি পরিমাণে অক্সিজেন রক্তে মেশাতে থাকে ও পেশীতে সেই অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত পৌঁছতে থাকে। হৃৎপিণ্ড রক্ত সরবরাহ বাড়ায় আবার দু'ভাবে। তার স্পন্দনের গতি বাড়িয়ে ও প্রতি স্পন্দনে হৃৎপিণ্ড থেকে নির্গত রক্তের পরিমাণ বাড়িয়ে (স্ট্রোক ভল্যুম)। হৃৎস্পন্দনের গতিকে স্ট্রোক ভল্যুম দিয়ে গুণ করে হৃৎপিণ্ড থেকে প্রতি মিনিটে নির্গত রক্তের পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়। ২) অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অন্ত্র, যকৃত ও বৃক্ক (কিডনি) থেকে রক্ত সরবরাহ কমিয়ে কর্মরত পেশীতে বেশি রক্ত সরবরাহ হতে থাকে। বিশ্রামরত অবস্থায় পেশীর জন্য যেখানে মোট রক্ত সরবরাহের ২০ শতাংশ বরাদ্দ থাকে, অ্যানঅ্যারোবিক থ্রেসহোল্ডের কাছাকাছি ব্যায়ামে এই মাত্রা ২০ শতাংশ থেকে বেড়ে ৮৫ শতাংশে পৌঁছে যায়।

অন্যান্য অনুকূল কারণের সঙ্গে শারীরিক পরিশ্রমে অধিক দক্ষ (ফিজিক্যালি ফিট, যেমন অ্যাথলেটদের) ব্যক্তিদের প্রতি হৃৎস্পন্দনে বেশি রক্ত নির্গত হয় বলে সমমাত্রার পরিশ্রমে হৃৎপিণ্ডের গতি পরিশ্রমে অদক্ষ ব্যক্তির চেয়ে অপেক্ষাকৃত ভাবে কম থাকে, অর্থাৎ পরিশ্রমে অদক্ষ ব্যক্তির চেয়ে তুলানমূলক ভাবে কম হৃৎস্পন্দনেই শারীরিক পরিশ্রমে অধিক দক্ষ ব্যক্তি একই পরিমাণ অক্সিজেন সম্পৃক্ত রক্ত সরবরাহ করতে পারে।

শারীরিক পরিশ্রমে দক্ষ ব্যক্তিদের কম হৃৎস্পন্দনে সমমাত্রার কাজ করার ক্ষমতা লাভজনক আরও একটি কারণে। হৃৎপেশীতে তার নিজের প্রয়োজনের অক্সিজেন সম্পৃক্ত রক্ত সরবরাহ হয় যখন হৃদপিণ্ড দুইটি হৃদস্পন্দনের (সিস্টোল) মধ্যবর্তী সময়ে রক্ত গ্রহণের জন্য প্রসারিত হতে থাকে (ডায়াস্টোল)। হৃৎস্পন্দনের গতি বৃদ্ধির সময় সহজবোধ্য কারণে প্রতি হৃৎস্পন্দনের জন্য বরাদ্দ সময় সংক্ষিপ্ত হতে থাকে ও এই সময় হ্রাসের ফলে 'বিষম হারে' ডায়াস্টোলের সময় কমে যায়। তাই যত বেশি হৃৎস্পন্দনের গতি হবে, হৃৎপেশীও রক্তের অভাবে তত তাড়াতাড়ি তার সর্বোচ্চ কর্মক্ষমতায় পৌঁছে যাবে। শারীরিক পরিশ্রমে অদক্ষ ব্যক্তিদের চেয়ে তাই শারীরিক পরিশ্রমে দক্ষ ব্যক্তিদের কম হৃৎস্পন্দনে কাজ করার ক্ষমতা তাদের (শারীরিক পরিশ্রমে দক্ষ ব্যক্তিদের) আরও বেশি তীব্রতার পরিশ্রমের কাজ কম আয়াসে করতে সাহায্য করে।

শরীরচর্চার দুইরূপ— (ক) **আইসোটোনিক ব্যায়াম**:

পেশীর টোন অথবা পেশীর অন্তর্নিহিত টান না বাড়িয়ে এই ব্যায়াম করা হয় বলে এমন নাম (আইসো= সমান, টোন = মাপ)। সব ব্যায়ামের সেরা এটা। এই ব্যায়ামে শরীরের বড় মাংসপেশী সমূহকে উচ্চ-মাঝারি মাত্রায় ছন্দোবদ্ধভাবে কমপক্ষে ২০ থেকে ৩০ মিনিট ধরে (বেশি হলে ক্ষতি নেই) কাজ করতে বাধ্য করা হয়। এতে হৃৎপিণ্ডকে অ্যানঅ্যারোবিক থ্রেসহোল্ডের সীমায় বেশ কিছুক্ষণ ধরে কাজ করতে হয়। এই ধরনের ব্যায়ামে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় বলে এটা অ্যারোবিক ব্যায়াম বলে বেশি পরিচিত। যে গুণগুলো থাকলে কোন ব্যায়ামকে অ্যারোবিক বলা যাবে সেগুলোকে আবার স্মরণ করা যাক : ১) শরীরের বড় মাংসপেশী সমূহ যেমন সফলতার ক্রম অনুযায়ী শরীরের নিম্নাঙ্গ, ঊর্ধ্বাঙ্গ ও মধ্যভাগ ব্যবহৃত হবে। ২) পেশীর অন্তর্নিহিত টান বাড়বে না, অর্থাৎ কোনো কিছু টানা বা ঠেলা চলবে না। অস্থিসন্ধিগুলি বাধাহীনভাবে পূর্ণ মাত্রায় ও ছন্দোবদ্ধভাবে ক্রমাগত কাজ করতে থাকবে। ৩) ব্যায়ামের সুফল পাবার জন্য দৈনিক ও এক দফায় ৩০ থেকে ৬০ মিনিট ধরে করতে হবে। ৪) ব্যায়ামের তীব্রতা এমন হবে যাতে হৃৎস্পন্দনের গতি ব্যক্তির বয়স অনুযায়ী সর্বোচ্চ অর্জনক্ষম

হৃৎস্পন্দনের গতির ৬০ থেকে ৭০ শতাংশের (অ্যানঅ্যারোবিক থ্রেসহোল্ডের) কাছাকাছি হয়। যেহেতু আগের বৈশিষ্ট্যে উল্লিখিত কারণে ব্যায়াম বেশ কিছুক্ষণ ধরে করে যেতে হবে, তাই ব্যায়ামের যে তীব্রতা হলে সেটা সম্ভব হবে, তা প্রথমের দিকে (শারীরিক ভাবে দক্ষ হয়ে ওঠার আগে) সেটা কম মাত্রার হবে। নিয়মিত অভ্যাস করতে থাকলে ক্রমশ অধিক মাত্রার ও অধিক সময় ধরে অ্যারোবিক ব্যায়াম করা সম্ভব হবে। ৫) ব্যায়ামের সুফল পাবার জন্য দৈনিক ও এক দফায় ৩০ থেকে ৬০ মিনিট ধরে করতে হবে। ৬) এটা অবশ্যই আনন্দদায়ক হতে হবে। না হলে অভ্যাসে পরিণত করা যাবে না। ৭) এই ব্যায়ামে শারীরিক কুশলতার প্রয়োজন না হলেই ভালো। ৮) ব্যায়ামের জন্য কোনো দুর্লভ ও দামি বস্তুর প্রয়োজন হওয়া অবাঞ্ছিত।

(খ) **আইসোমেট্রিক ব্যায়াম**: এই ধরনের ব্যায়ামে পেশীর মাপের পরিবর্তন হয় না (আইসো = সমান, মেট্রিক = মাপ)। ব্যায়ামরত পেশীগুলি কোনও অস্থিসন্ধির সঞ্চালন ছাড়াই সংকুচিত হতে থাকে, ফলে পেশীর অন্তর্নিহিত টান প্রচণ্ডভাবে বেড়ে যায়। ভারোত্তোলন বা ভারী কোনো বস্তু মাথার ওপর তুলে ধরে থাকলে ঐ বস্তুর মাধ্যাকর্ষণের সমান শক্তি দিয়ে আমাদের ঊর্ধাঙ্গ বস্তুটিকে ওপরের দিকে ঠেলে ধরে। ফলে ওপরে ধরে থাকা অবস্থায় পেশী বা অস্থিসন্ধির সঞ্চালন হয় না বটে, কিন্তু ঊর্ধাঙ্গের পেশীতে শক্তি উৎপন্ন হয় যেটা পেশীর অন্তর্নিহিত টান বাড়িয়ে দেয়। এই ধরনের ব্যায়ামে পেশীর তন্তুগুলি মোটা হয়ে ও কিছুটা সংখ্যায় বেড়ে পেশীর মাপ ও শক্তি তাড়াতাড়ি বাড়াতে সাহায্য করে বলে দেহসৌষ্ঠব বাড়ানোর জন্য এটা বেশ জনপ্রিয়। এই ব্যায়াম করার সময় পেশীর অন্তর্নিহিত টান বেড়ে থাকার জন্য পেশীর মধ্যকার রক্তনালীগুলি চাপে পড়ে সরু হয়ে যায় (আইসোটোনিক ব্যায়ামের উল্টো) ও ব্যায়ামে কর্মরত পেশীর রক্তনালীতে রক্তপ্রবাহে বাধাদানের ক্ষমতা বেড়ে যায়। ফলে হৃৎপিণ্ডকে অনেক জোরে ও রক্তের চাপ অনেক বাড়িয়ে পর্যাপ্ত রক্তপ্রবাহ চালু রাখতে হয়। অর্থাৎ আইসোমেট্রিক ব্যায়ামে আইসোটোনিক ব্যায়ামের থেকে রক্তচাপ অনেকটা বেড়ে থাকে। এছাড়া আইসোমেট্রিক ব্যায়ামে রক্তনালীগুলি চাপে পড়ে সরু হয়ে যাওয়ার জন্য কর্মরত পেশীতে পর্যাপ্ত অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্তে অভাব ঘটে ও খুব শীঘ্র অক্সিজেন বিহীন (অ্যানঅ্যারোবিক) পদ্ধতিতে শক্তি (অ্যাডিনোসন ট্রাই ফসফেট) তৈরি শুরু হয়ে যায়। আইসোমেট্রিক ব্যায়াম তাই মূলত অ্যানঅ্যারোবিক ব্যায়াম। খুব বেশিক্ষণ এই ব্যায়াম চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। অসুবিধা আরও আছে, লক্ষ্য করে থাকবেন বেশ কিছুটা ভারী বস্তু মাথার ওপরে তোলার সময় দম বন্ধ করে পেশীতে জোর লাগাতে হয়। এই প্রক্রিয়াকে বিজ্ঞানের পরিভাষায় 'ভাল্‌সাল্‌ভা' বলে। এতে প্রচণ্ড পরিমাণে এবং খুব তাড়াতাড়ি রক্তচাপ বেড়ে যায় আর হৃৎপিণ্ডে পুনর্ব্যবহারের জন্য রক্ত ফিরে আসা কমে যায় (decreased venous return)। কম রক্তের জোগান ও উচ্চ রক্তচাপের ধকল সইবার মতো হৃৎপেশী সবল না থাকলে প্রাণান্তকর হৃদপিণ্ডের ছন্দপতন (life threatning cardiac arrhythmia) ঘটার সম্ভাবনা থেকে যায়। এই ধরনের ব্যায়ামের একমাত্র সুফল, পেশীবৃদ্ধি ও পেশীর শক্তিবৃদ্ধি। এতে সামগ্রিকভাবে হৃৎপিণ্ডের বিশেষ কোনও উপকার হয় না বরং রক্তচাপ বৃদ্ধি ও অ্যানঅ্যারোবিক পদ্ধতির অধিক ব্যবহারের জন্য হৃদরোগীদের পক্ষে এটা অনুপযুক্ত। অবশ্য সঠিক মাত্রায় অ্যারোবিক ব্যায়াম করতে পারার জন্য পেশীসমূহকে উপযুক্ত করার জন্য পরিমিত পরিমাণে আইসোমেট্রিক ব্যায়াম করা যেতে পারে।

শারীরিক পরিশ্রমের কাজ আর ব্যায়াম সমার্থক নয় :

কেউ কেউ প্রশ্ন করেন, আমি তো সারাদিনই ঘরে কাজ করি, কতবার যে সিঁড়ি ভাঙতে হয়, আবার অনেকে বলেন সাইটে (যেখানে নির্মাণ কাজ হয়) ঘুরে বেড়াতে হয়, আমার আবার আলাদা করে ব্যায়ামের কী প্রয়োজন! যুক্তি না দিতে ইচ্ছে হলে, বলতে হয়, কাজে ক্ষয় হয়, ব্যায়ামে মেরামত হয়। প্রথমে যুক্তি ও পরে প্রমাণ পেশ করব। কাজের খাতিরে যে পরিশ্রম, তাতে ক্ষেপে ক্ষেপে পেশীর সঞ্চালন ঘটে। হৃৎস্পন্দন একনাগাড়ে বেশ কিছুক্ষণ ধরে বেড়ে থাকতে পারে না, হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসকে একনাগাড়ে অক্সিজেন ব্যবহারের ঊর্ধ্বসীমা বা ভি ও টু ম্যাক্স কাছাকাছি যথেষ্ট সময় ধরে কাজ করানো যায় না। অ্যারোবিক ব্যায়ামের এটা ন্যূনতম বৈশিষ্ট্য। অ্যারোবিক ব্যায়াম শুরু করার ৫-৭ মিনিট পরে যখন শরীরে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা যায়, সেই সময় থেকে ঐ ব্যায়ামের প্রয়োজনীয় সুফলগুলির প্রক্রিয়া শুরু হয় ও ফল লাভের জন্য ব্যায়ামের মাত্রা অভিন্ন রেখে ব্যায়াম অন্তত ৩০-৪০ মিনিট চালিয়ে যেতে হয়। কাজের সময় দেখা যায় তার আগেই কাজের খাতিরে একই তীব্রতায় ছন্দোবদ্ধ পেশী সঞ্চালনে ছেদ পড়ে। আরও একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। গবেষকরা নির্ণয় করেছেন, কাজ সম্পর্কিত পরিশ্রমের আনুষঙ্গিক মানসিক উৎকণ্ঠা (যেটা ব্যায়ামে থাকা উচিত নয়) ব্যায়ামের সুফল লাভের আর এক অন্তরায়। এই কারণে রিক্সাওয়ালা বা ঠেলাগাড়ির চালকদের সবথেকে সুরক্ষা পাবার কথা, কিন্তু সে রকম কোনও প্রমাণ নেই। বরং ইদানিং এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, কাজ সম্পর্কিত নয়, অবসর সময়ের শারীরিক পরিশ্রম করা ব্যক্তিদের হৃদরোগের সম্ভাবনা তাৎপর্যপূর্ণভাবে কম। ৫২টি দেশে চালানো ১০০৪৩ জন প্রথম হৃদরোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের ওপর সমীক্ষায় এই তথ্য পাওয়া গেছে (Intraheart study, European Heart Journal 2012, 33, pp. 452-466)। সুতরাং আরও জানা গেল যে অ্যারোবিক ব্যায়াম করতে হবে অবসর সময়, যখন মানসিক

উৎকণ্ঠা থাকবে না আর নিরবচ্ছিন্ন ভাবে কম পক্ষে ৩০-৪০ মিনিট সময় ধরে সেটা করা যাবে। জামাইকায় ১২৮ জন সেরিব্রাল স্ট্রোকের রুগীর উপর চালানো এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, নিয়মিত ঘরের বাইরে জোরকদমে হাঁটা ও ঘরে বসে ম্যাসাজের মধ্যে প্রথমোক্ত প্রক্রিয়া জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে ও বিশ্রামরত অবস্থায় হৃৎস্পন্দনের গতি কমাতে বেশি সক্ষম।

শরীরচর্চা ও রোগপ্রতিরোধ — হৃদরোগ প্রতিরোধের যে কারণগুলো জানা গেছে, তার মধ্যে সবচেয়ে অবহেলিত হল অ্যারোবিক শরীরচর্চা। অথচ উচ্চরক্তচাপ, ডায়াবেটিস, স্থূলতা, তামাকের ব্যবহারের মতো শরীরচর্চার অভাবও সমমাত্রার হৃদরোগ সৃষ্টির এক কারণ। মেদ কমানো ছাড়াও অ্যারোবিক শরীরচর্চা আলাদাভাবে হৃদরোগ নিবারণ করে। এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা ও প্রমাণের অভাব নেই। স্থানাভাবে তার বিস্তারিত উল্লেখ করা গেল না। যাঁরা নিয়ম করে ব্যায়াম নয়, জীবনযাত্রায় কেবলমাত্র শারীরিক শ্রম করেন, তাঁদের হৃদরোগে ও সেরিব্রাল স্ট্রোকে মৃত্যু হার ৩০ শতাংশ কম। ২২টি উচ্চমানের সমীক্ষার সম্মিলিত বিশ্লেষণে (metaanalysis of randomized clinical trials) দেখা গেছে, হার্ট অ্যাটাকের পরে নিয়ন্ত্রিতভাবে শরীরচর্চার ফলে ২২ শতাংশ রুগীর জীবনযাত্রার মান উন্নীত হয়, আর ২৫ শতাংশের হঠাৎ মৃত্যু রোধ করা যায় (ó Connor 1989, Oldridge 1988)। অ্যারোবিক শরীরচর্চার ফলে প্রতি মিনিটে হৃদপিণ্ড থেকে অধিক পরিমাণে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত নির্গত হবার ফলে (increased stroke volume) আর পেশীতে রক্ত থেকে অধিক পরিমাণে অক্সিজেন আহরণ করতে (increased oxygen extracting capacity of skletal muscle) পারার ফলে হৃদরোগাক্রান্ত ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত কম হৃৎস্পন্দনের গতিতে দৈনন্দিনের কাজকর্ম চালাতে পারে। এর ফলে হৃৎপিণ্ডকে কম কাজ (decreased myocardial oxygen demand) করতে হয় ও সরু হয়ে যাওয়া রক্তনালী দিয়ে কম রক্ত হৃৎপিণ্ডে সরবরাহ হয় তাতে সেই কাজ করাটা সহজ হয়। রোগীর জীবনযাত্রার মানের গুণগত মানোন্নয়ন ঘটে। হৃদরোগীদের সরু হয়ে যাওয়া রক্তনালী কেবল ওষুধ দিয়ে স্বাভাবিক করে দেওয়া যায় না বটে, কিন্তু নিয়মিত নিয়ন্ত্রিত অ্যারোবিক ব্যায়ামের ফলে হৃদরোগীরা আগের চেয়ে বেশি তীব্রতার কাজ করতে পারে এবং সেটা পারে অনেক কম মাত্রার ওষুধে। রোগের মাত্রা অনুযায়ী হৃদরোগীদের বুকে ব্যাথা হবার একটা বিশেষ পরিশ্রমের মাত্রা থাকে (Heart rate/ ST threshold) যেটা আরও সঠিকভাবে হৃৎস্পন্দনের গতির উপরে নির্ভর করে। সুস্থ ও রোগাক্রান্ত কিন্তু নিয়মিত অ্যারোবিক শারীরিক ব্যায়ামে প্রশিক্ষিত হৃৎপিণ্ড যেহেতু সমমাত্রার কাজ অপেক্ষাকৃত কম হৃৎস্পন্দনের গতিতেই সম্পন্ন করতে পারে তাই সে ক্ষেত্রে বিনা কষ্টেই সেই মাত্রার পরিশ্রম করা সম্ভব হয়। বাইপাস অপারেশনের পরেও নিয়মিত নিয়ন্ত্রিত অ্যারোবিক ব্যায়ামে পরিশ্রম করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় (Hanson, 1985)। দীর্ঘকাল ধরে ভোগার পরে বিশেষ করে চিকিৎসায় অবহেলা হলে এক সময় হৃৎপেশী দুর্বল হয়ে পড়ে ও রক্ত পাম্প করার ক্ষমতা কমে যায়। এই অবস্থায় পরিশ্রম করলে পেশীতে যে বেশি অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্তের প্রয়োজন হয় সেটা যোগাতে হৃৎপিণ্ড সক্ষম হয় না। ফলে শ্বাসকষ্ট হয়। এমতাবস্থায় নিয়মিত কম মাত্রার অ্যারোবিক শারীরিক ব্যায়ামে পেশীর কর্মক্ষমতা বাড়ায়, অ্যানঅ্যারোবিক থ্রেসহোল্ড বাড়ায়, পেশীতে রক্ত সরবরাহকারী নালীগুলোকে মোটা করে ও রক্ত থেকে পেশীর অক্সিজেন আহরণ ক্ষমতা বাড়ায় (Uren & Lipkin, 1992)। ফলে দৈনন্দিন কাজকর্ম কম কষ্টে করা যায়।

> দেহের ওজন কমানোর কোনো শর্টকাট নেই। পাতিলেবুর রস বা টক দই চর্বি গলাতে পারে না। কর্পোরেট কালচারের স্বল্পমেয়াদি খাবার ও ব্যায়ামের ক্র্যাশকোর্স ওজন সাময়িকভাবে কমালেও কোর্সের পরে ওজন শীঘ্রই বেড়ে প্রাথমিক অবস্থায় ফিরে যায়। কসমেটিক সার্জারি ও লাইপোসাকশনে কমানো ওজন ক্ষণস্থায়ী। বেরিয়াট্রিক সার্জারিতে অবশ্য পাকাপাকিভাবে ওজন কমানো যায় চড়া অর্থমূল্যে ও অনেক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার সঙ্গে আপস করে।

শরীরচর্চা ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি : আমাদের কাজ করার ক্ষমতা নির্ভর করে পেশীগুলি কত জোরে, কত দ্রুত ও কতক্ষণ ধরে কাজ করে যেতে পারে তার ওপর। সেটা আসলে নির্ভর করে ১) পেশীগুলির শক্তি ও ২) হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস ও রক্তনালীর অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত সরবরাহ করার ক্ষমতা এবং রক্ত থেকে পেশীর অক্সিজেন আহরণ ক্ষমতার উপর। পেশীর প্রথমোক্ত গুণটি অ্যারোবিক ও অ্যানঅ্যারোবিক ব্যায়ামে উৎকর্ষ লাভ করে। দ্বিতীয় গুণটি মূলত অ্যারোবিক ব্যায়ামে বৃদ্ধি পায়। ব্যায়াম বন্ধ করে দিলে এই গুণগুলি ৪-৫ দিন পর থেকে কমতে শুরু করে, তাই কর্মক্ষমতা বজায় রাখার জন্য ৪ দিনের বেশি শরীরচর্চায় ছেদ দিতে নেই।

শরীরচর্চা ও স্থূলতা নিবারণ : আধুনিক জীবনে শারীরিক শ্রমলাঘব হবার জন্য ও খাদ্য তালিকায় শক্তিঘন খাবারের প্রাচুর্যের জন্য বর্তমান প্রজন্মের কাছে মেদবৃদ্ধি এক ক্রমবর্ধমান সমস্যা।

আগে এটা শহুরে সমস্যা থাকলেও এখন এটা গ্রামাঞ্চলেও প্রাসঙ্গিক। দেহের আকর্ষণীয়তা হারাবার সঙ্গে সঙ্গে মেদবহুল শরীর বহু অনিরাময়যোগ্য রোগের উৎস। উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, সেরিব্রাল স্ট্রোক, কিডনির অসুখের অন্যতম কারণ মেদবৃদ্ধি। এমন মোটা ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া যাবে না যে রোগা হবার একাধিক অসফল প্রচেষ্টা করেছেন। সফলকাম হবার জন্য প্রথমেই মনে গেঁথে নিতে হবে যে দেহের ওজন কমানোর কোনো শর্টকাট নেই। পাতিলেবুর রস বা টক দই চর্বি গলাতে পারে না। কর্পোরেট কালচারের স্বল্পমেয়াদি খাবার ও ব্যায়ামের ক্র্যাশকোর্স ওজন সাময়িকভাবে কমালেও কোর্সের পরে ওজন শীঘ্রই বেড়ে প্রাথমিক অবস্থায় ফিরে যায়। কসমেটিক সার্জারি ও লাইপোসাকশনে কমানো ওজন ক্ষণস্থায়ী। বেরিয়াট্রিক সার্জারিতে অবশ্য পাকাপাকিভাবে ওজন কমানো যায় চড়া অর্থমূল্যে ও অনেক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার সঙ্গে আপস করে।

আমাদের শরীরের ওজন যদি ব্যাঙ্কের আমানত হয়, তবে খাবার হল টাকা জমা দেওয়া আর শারীরিক পরিশ্রম হল টাকা তোলা। খনিকের প্রচেষ্টা নয়, ধারাবাহিক ভাবে নিয়ন্ত্রিত সুষম স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক শ্রম করে যেতে হবে। মনে রাখতে হবে : ক্যালোরি ইন (খাবার গ্রহণ) —ক্যালোরি আউট (শারীরিক শ্রম ও ব্যায়াম) = মেদবৃদ্ধি। এছাড়া অন্য কোনও সমীকরণ নেই। আগেই আলোচনা করেছি, বিভিন্ন রকমের ব্যায়ামের মধ্যে অ্যারোবিক ব্যায়ামেই শক্তি বা ক্যালোরি খরচ হয় সবথেকে বেশি। একজন ৭০ কিলোগ্রাম ওজনের ব্যক্তি যদি একটা প্রমাণ মাপের সিঙারা খেয়ে (৩০৮ কিলোক্যালরি গ্রহণ) সেটা খরচ করতে চায় তবে তাকে ঘণ্টায় ৪ কিলোমিটার বেগে দেড় ঘণ্টা (মোট ৬ কিলোমিটার) হাঁটতে হবে (৩২০ কিলোক্যালোরি খরচ)। অর্থাৎ প্রমাণ মাপের একটা সিঙারায় মানুষ চলে ৬ কিলোমিটার। প্রকৃতির সৃষ্টি জীবসমূহের মতো এমন জ্বালানি সাশ্রয়কারী যন্ত্র মানুষ বানাতে পারে নি।

একজন ৭০ কিলোগ্রাম ওজনের ব্যক্তি যদি একটা প্রমাণ মাপের সিঙারা খেয়ে (৩০৮ কিলোক্যালরি গ্রহণ) সেটা খরচ করতে চায় তবে তাকে ঘণ্টায় ৪ কিলোমিটার বেগে দেড় ঘণ্টা (মোট ৬ কিলোমিটার) হাঁটতে হবে (৩২০ কিলোক্যালোরি খরচ)। অর্থাৎ প্রমাণ মাপের একটা সিঙারায় মানুষ চলে ৬ কিলোমিটার। প্রকৃতির সৃষ্টি জীবসমূহের মতো এমন জ্বালানি সাশ্রয়কারী যন্ত্র মানুষ বানাতে পারে নি।

প্রাণায়াম ও যোগ ব্যায়াম : মনে করা হয়, ভারতবর্ষের সাধুসন্তদের দ্বারা প্রবর্তিত, প্রচারিত ও পরিবর্ধিত এই ধরনের ব্যায়াম আমাদের দেশের সুপ্রাচীন জীবনশৈলীর জন্য যথেষ্ট ও উপযুক্ত ছিল। তখন খাবারের প্রাচুর্য ছিল না। মেদবহুল হয়ে পড়ার কোনো সম্ভাবনা তো ছিলই না, বরং প্রাণায়াম ও যোগ ব্যায়ামের দ্বারা কম শক্তি খরচ করে পেশী ও অস্থিসন্ধিসমূহকে সচল রাখাই ছিল তাঁদের প্রাথমিক প্রয়োজন। বর্তমানের প্রাণায়াম ও যোগ ব্যায়ামের প্রবক্তাগণ অবশ্য কেবল মাত্র এত অল্প যুক্তিগ্রাহ্য ফলের উপর ভরসা করতে পারেন না। তাঁদের পণ্যের (দুর্ভাগ্যক্রমে প্রাণায়াম ও যোগ ব্যায়াম এখন পণ্য) প্রচারে আমদানি করতে হয় সহজে মাপা যায় না ও সাধারণ মানুষের কাছে অস্পষ্ট 'প্রাণশক্তি', 'আত্মিক উন্নতি' ইত্যাদি গুণের। শরীরবিজ্ঞানে ব্যবহৃত কিছু অঙ্গের নামের সঙ্গে কষ্টকল্পিত ক্রিয়ার এক খিচুড়ি হাঁসজারু মার্কা ভাসা ভাসা ব্যাখ্যার অবতারণা করে মোটা দক্ষিণার বিনিময়ে পরিষেবা বেচতে হয়। এদের অনেকে মাদুলি কবচ বিক্রি করেন না বটে, তবে দস্তুর মতো চিকিৎসকদের অনুকরণ করে, প্রেসক্রিপশন করেন ও নিজেদের তৈরি ওষুধও বিক্রি করেন।

বিজ্ঞানসম্মতভাবে যোগব্যায়ামের সুফল দর্শানোর কিছু পরীক্ষানিরীক্ষা হয়েছে। তবে সেগুলো প্রামাণ্যের বিচারে উচ্চ মানের নয়। সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত এক নিবন্ধে দেখানো হয়েছে, ১০০ জন ডায়াবেটিস রুগী দৈনিক ১ ঘণ্টা করে ৩ মাস ধরে যোগাসন, প্রাণায়াম ও ধ্যান করার ফলে মোট কোলেস্টেরল, লঘু ঘনত্বের কোলেস্টেরল ও ট্রাইগ্লিসারাইড কমেছে, যদিও তাদের দেহভর বা ওজন কমে নি (Indian Heart Journal, Vol 65, Number 2, March-April 2013 pp 127-136)। এত কম সংখ্যার রুগী নিয়ে পরীক্ষা শুধু আশা জাগায়, সর্বজনগ্রাহ্যভাবে এর সফলতা প্রমাণ করে না। এই পরীক্ষার পরীক্ষকরা অবশ্য অনুমান করেছেন কেবল শক্তি (ক্যালোরি) খরচের তত্ত্বে যোগব্যায়াম ও প্রাণায়ামের সুফল ব্যাখ্যা করা যাবে না। মানসিক উৎকণ্ঠা প্রশমণ ও তৎসম্পর্কিত ক্ষতিকারক বিভিন্ন হরমোনের (কর্টিসল, অ্যাড্রেনালিন) মাত্রাহ্রাস, উত্তেজক স্নায়ুর (সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম) ক্রিয়া দমনের মাধ্যমে যোগব্যায়াম ও প্রাণায়াম উপকার করে। অবশ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে অ্যারোবিক ব্যায়ামের কার্যকারিতা যেমন সপ্রমাণ হয়েছে, এ ক্ষেত্রে তেমন সফল পরীক্ষা কেউ করে নি। প্রাণায়ামের ব্যাপারীদের অবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার অসারতা প্রমাণ এই প্রবন্ধের বিষয় নয়, বদলে দেখা যাক অ্যারোবিক ব্যায়ামের বদলে প্রাণায়াম করলে ক্ষতি কী?

আধুনিক জীবনযাপনের প্রয়োজনে শারীরিক শ্রমলাঘব হবার জন্য ও খাদ্যতালিকায় শক্তিঘন খাবারের প্রাচুর্যের জন্য বর্তমান প্রজন্মের কাছে মেদবৃদ্ধি এক ক্রমবর্ধমান সমস্যা। এমন মাঝবয়সি

ব্যক্তি খুঁজে পেতে বেগ পেতে হবে যে তার কলেজ জীবনের প্যান্ট পরতে পারবে, অথচ ২৫ বৎসর বয়সের পর কোমরের মাপ বাড়ার কথা নয়। অর্থাৎ বর্তমান যুগোপযোগী ব্যায়ামের যে দুটো বৈশিষ্ট্য প্রাণায়ামে পাওয়া যাবে না তা হল — ১) যথেষ্ট পরিমাণে শক্তি খরচ, যেটা কেবল মাত্র অ্যারোবিক ব্যায়ামেই পাওয়া যাবে। ব্যায়ামে বা যে কোনও ধরনের কাজে যে শক্তি খরচ হয় সেটা ব্যায়াম বা কাজের তীব্রতা ও তার স্থায়িত্বকালের সাথে সমানুপাতিক হারে বাড়ে। আমরা আগেই আলোচনা করেছি, ব্যায়াম বা কাজের তীব্রতা বৃদ্ধির সাথে সাথে পেশীতে অক্সিজেন ব্যবহার বাড়তে থাকে। প্রাণায়ামে পেশীর তীব্রহারে ব্যবহারের সুযোগ কই? সচেতনভাবে ঘন ঘন শ্বাস নেবার প্রাণায়ামের প্রক্রিয়াগুলো (পেশীতে অধিক হারে অক্সিজেন খরচ হবার ও বেশি পরিমাণে কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হবার সুযোগ না থাকার জন্য) শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ার স্বত্রাভাবিক নিয়মে (রক্তে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ কমে যাবার জন্য) পাঁচ দশ মিনিট স্তিমিত হয়ে যেতে বাধ্য (negative feedback)। ২) উপযুক্ত শরীরচর্চার ফলে যে শারীরিক দক্ষতাবৃদ্ধি হয় ও অনিরাময়যোগ্য রোগসমূহের নিবারণ করা যায় তার জন্য প্রয়োজন এমন ব্যায়াম যাতে যথেষ্ট হৃৎস্পন্দন বৃদ্ধি হয় (সর্বোচ্চ সীমার ৭০ শতাংশ) এবং সেই মাত্রার ব্যায়াম কমপক্ষে চালিয়ে যেতে হয় ৩০ থেকে ৪০ মিনিট ধরে। প্রাণায়ামে আর যাই হোক হৃৎস্পন্দন বৃদ্ধি ঘটে না।

ব্যায়ামের প্রেসক্রিপশনে প্রাণায়াম ও যোগব্যায়ামের বিশেষ কিছু ভূমিকা থাকলেও সেটা গৌণ। যদি মেদবৃদ্ধি আপনার সমস্যা হয়, যদি না থেমে চারতলা সিঁড়ি ভাঙতে আপনি হাঁপিয়ে ওঠেন তবে প্রাণায়াম আপনার জন্য নয়। আপনি যদি নীরোগ ও দীর্ঘজীবন কামনা করে ব্যায়াম শুরু করতে চান অথবা আপনি যদি শারীরিক দক্ষতা বাড়াতে চান তবে প্রাণায়াম বা যোগব্যায়ামে কাঙ্খিত ফল লাভ হবে না। ব্যায়ামের জন্য অঢেল সময় থাকলে এক ঘণ্টা অ্যারোবিক ব্যায়াম (জোর কদমে হাঁটা, জগিং করা, সাঁতার কাটা ইত্যাদি) করে তারপর আরও সময় ও উদ্যম থাকলে প্রাণায়াম এবং /অথবা যৌগিক ব্যায়াম করুন। প্রাণায়াম ও যোগব্যায়ামের উপকারের থেকে অতিরঞ্জনটুকু (ডায়াবেটিস ও হাঁপানি সারায়) বাদ দিয়ে বলা যায়, প্রাণায়াম ও যোগব্যায়াম বিক্ষিপ্ত মনে প্রশান্তি আনে, ক্লিষ্ট টানধরা অনমনীয় (irritable and tensed) পেশীতে নমনীয়তা দেয় আর অস্থিসন্ধি সচল রাখে। প্রাণায়াম ও যোগব্যায়ামের হিতৈষী ও প্রবক্তারা প্রাণায়াম ও যোগ ব্যায়ামের সঙ্গে জড়িত অবৈজ্ঞানিক উচ্ছ্বাসগুলো ত্যাগ করতে পারলে প্রাণায়াম ও যোগব্যায়ামের সর্বজনগ্রাহ্য প্রসার সম্ভব। কালেভদ্রে ব্যায়ামের সময়হ্রাস করার প্রয়োজন হলে অ্যারোবিক নয়, প্রাণায়াম বা যৌগিক ব্যায়াম কাটছাঁট করুন। অ্যারোবিক ব্যায়ামের উপকার সঞ্চয়যোগ্য নয়। যুবাকালের ব্যায়ামের সুফল বৃদ্ধ বয়সে পাওয়া যাবে না। দেখা গেছে ব্যায়ামের সুফল ব্যায়াম বন্ধ করার পরে চার পাঁচদিন স্থায়ী থাকে। দাঁত মাজা, স্নান করা ইত্যাদি প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় ক্রিয়াসমূহের মতো অ্যারোবিক ব্যায়ামেরও প্রয়োজন আছে। অগ্রাধিকারের তালিকায় একে জুড়ে নিন।

শরীরচর্চার নিদান: দিনের ২৪ ঘণ্টার মধ্য থেকে কমপক্ষে ১ ঘণ্টা বরাদ্দ করে রাখুন ব্যায়ামের জন্য। সকালে না পারলে অন্য সময়েও চলবে, কেবল গ্রীষ্মকালে চড়া রোদের সময় হলে ঘরের মধ্যে করার উপযুক্ত অ্যারোবিক ব্যায়াম বেছে নিতে হবে।

গা-গরম করা: টানা অ্যারোবিক ব্যায়ামের জন্য শরীরকে উপযুক্ত করার জন্য প্রথমে ৫ মিনিট হাল্কা খালি হাতের ব্যায়াম অথবা হাঁপিয়ে পড়বেন না এমন দৌড়ঝাঁপের ব্যায়াম করে শরীর গরম করে নিন। এতে শরীরে রক্ত চলাচল বেড়ে গিয়ে হৃৎস্পন্দনের গতি ৯০ থেকে ১০০ হবে। হঠাৎ তীব্রতার জেরে পেশীতে টান পড়বে না। এই সময় অল্প অল্প ঘাম হবে আর শ্বাসের গতি দ্রুত হবে। দেখবেন, এই কারণেই ফুটবলাররা মাঠে নামার আগে মাঠের পাশে হালকা দৌড়ে গা-গরম করে নেয়।

অ্যারোবিক ব্যায়াম — ব্যায়ামের ধরণ : পছন্দ, দিনের সময় ও ব্যায়ামের স্থান অনুযায়ী নীচের যে কোনো একটা করা যেতে পারে। ঘণ্টায় ৪ থেকে ৬ কিলোমিটার বেগে জোর কদমে হাঁটা, জগিং করা, সাঁতার কাটা, দড়ি অথবা দড়িছাড়া লাফানো, গানের তালে অথবা সেটা ছাড়াই নাচা, ব্যাডমিন্টন, স্কোয়াস বা টেনিস খেলা ইত্যাদি। এর মধ্যে জোর কদমে হাঁটায় (থেমে থেমে ছাদের উপর হাঁটায় সুফল কম) শারীরিক দক্ষতার প্রয়োজন সব থেকে কম ও সবার জন্য উপযুক্ত কিন্তু সমানভাবে উপকারী।

ব্যায়ামের তীব্রতা : অ্যারোবিক ব্যায়ামের সুফল লাভের জন্য এর তীব্রতা এমন হবে যাতে সর্বোচ্চ অক্সিজেনের ব্যবহার হবে ঐ ব্যক্তির অ্যানঅ্যারোবিক থ্রেসহোল্ডের ঠিক নীচে। যদি ব্যায়াম চলাকালীন নাড়ীর গতি মাপার ব্যবস্থা করা যায় (এরকম বৈদ্যুতিন যন্ত্র বাজারে পাওয়া যায়) তবে যে ব্যায়ামের তীব্রতায় নাড়ির গতি সর্বোচ্চ অক্সিজেন ব্যবহারের ক্ষমতার ৭০ শতাংশ হয় সেই তীব্রতার ব্যায়াম করে যেতে হবে। ব্যক্তিবিশেষে সর্বোচ্চ অক্সিজেন ব্যবহারের ক্ষমতা পার্থক্য থাকলেও কাজ চালানোর জন্য নিচের সমীকরণগুলো কাজের।

১) সর্বোচ্চ অক্সিজেন ব্যবহারের ক্ষমতায় প্রতি মিনিটে হৃৎস্পন্দনের গতি = ২২০ বয়স (বৎসরে) মহিলাদের ক্ষেত্রে ২২৬ = বয়স (বৎসরে)।

২) বিশ্রামরত অবস্থায় প্রতি মিনিটে হৃৎস্পন্দনের গতি

৩) বৃদ্ধিযোগ্য হৃদস্পন্দনের গতি '১'—'২' (heart rate reserve)

৪) অ্যারোবিক ব্যায়ামকালের প্রতি মিনিটে হৃৎস্পন্দনের গতির

নিম্নসীমা — '২ + '৩'-এর ৬০ শতাংশ

৫) অ্যারোবিক ব্যায়ামকালের প্রতি মিনিটে হৃৎস্পন্দনের গতির উর্ধ্বসীমা = '২' + '৩'-এর ৮৫ শতাংশ

অ্যারোবিক ব্যায়ামকালের প্রতি মিনিটে হৃৎস্পন্দনের গতির সীমা= '৪' থেকে '৫'

আপনার বয়স ৫০ বৎসর হলে আর আপনার বিশ্রামরত অবস্থায় প্রতি মিনিটে হৃৎস্পন্দনের গতি ৬২ হলে উপরের সমীকরণ থেকে সর্বোচ্চ অক্সিজেন ব্যবহারের ক্ষমতায় প্রতি মিনিটে হৃৎস্পন্দনের গতি হবে ২২০ – ৫০=১৭০, বৃদ্ধিযোগ্য হৃৎস্পন্দনের গতি হবে ১৭০– ৬২ = ১০৮, আর সঠিক তীব্রতার অ্যারোবিক ব্যায়ামে প্রতি মিনিটে হৃৎস্পন্দনের গতি থাকবে (৬২+১০৮×০.৬০) বা ১২৭ থেকে (৬২+১০৮×০.৮৫) বা ১৫৫।

ব্যায়াম করার সময় প্রতিবারে হৃৎস্পন্দনের গতি মাপার প্রয়োজন নেই, দু'একবার মেপে নিলে আন্দাজ হয়ে যাবে। আর একটা সহজ উপায় আছে, যেটাকে বলে 'গান গাওয়া-কথা বলা-শ্বাসকষ্টের জন্য কথা বলতে না পারা' পদ্ধতি (Sing-talk-gasp, Hall 1993)। ব্যায়ামের যে তীব্রতায় আপনি কোনো মতে কথা বলতে পারবেন, গান গাইতে পারবেন না, সেটা সঠিক ব্যায়ামের তীব্রতা।

ব্যায়াম কতক্ষণ--- যেহেতু সঠিক তীব্রতায় অ্যারোবিক ব্যায়াম শুরু করার প্রায় দশ মিনিট পর থেকে শরীরের অভ্যন্তরীণ স্বাস্থ্যবর্ধক ক্রিয়াকলাপ শুরু হয় (যখন থেকে শরীরে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে শুরু হয়) তাই আপনার ব্যায়ামে বরাদ্দ করা সময় ও শারীরিক দক্ষতা অনুযায়ী কম করে ৩০-৬০ মিনিট ধরে ব্যায়াম চালিয়ে যাওয়া উচিত। ব্যায়ামের সময় বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে সুফলগুলি প্রথমে আনুপাতিক হারে বাড়তে থাকলেও দেখা গেছে ৬০ মিনিটের পরে অ্যারোবিক ব্যায়ামে সুফলের বৃদ্ধি আনুপাতিক নয়। বরং তাতে পেশী ও অস্থিসন্ধিতে আঘাতের হার বেড়ে যায়।

ধীরে ধীরে ব্যায়াম পর্ব শেষ করা (কুলিং ডাউন)— অ্যানঅ্যারোবিক থ্রেসহোল্ডের তীব্রতায় ব্যায়াম করতে করতে হঠাৎ থেমে যাবেন না। শেষের পাঁচ মিনিট ধীরে ধীরে ব্যায়ামের তীব্রতা কমিয়ে নিয়ে তারপর বিশ্রাম নিন।

যোগ ব্যায়াম ও ধ্যান — যথার্থ প্রশিক্ষণ থাকলে ও ১৫ থেকে ৩০ মিনিট অতিরিক্ত সময় বরাদ্দ থাকলে যোগব্যায়াম (আসন), প্রাণায়াম ও ধ্যান করতে পারেন। অ্যারোবিক ব্যায়ামে যে সাময়িক ক্লান্তি আসবে যোগ ব্যায়াম ও ধ্যানে সেটা সত্বর দেহে ও মনে শক্তি ও প্রশান্তি এনে দেবে।

পরিশিষ্ট

বিভিন্ন শারীরিক কাজে শক্তিখরচের পরিমাণ কিলোক্যালোরি প্রতি ঘণ্টায়

কাজের বিবরণ	মেটস	কিলোক্যালোরি/ঘণ্টা
শুয়ে থাকা	১	৬০
বসে থাকা	১.৫	৯০
দাঁড়িয়ে থাকা	২.৬	১৫৬
গাড়ি চালানো	২.৮	১৬৮
কাপড় কাচা	৩.১	১৮৬
ঘরের মধ্যে হাঁটা	৩.১	১৮৬
মোটরসাইকেল চালানো	৩.৪	২০৪
ঘর মোছা	৩.৯	২৩৪
মাঝারি তালে নাচা	৪.২	২৫২
অপ্রতিযোগিতামূলক স্কেটিং	৫	৩০০
ঘণ্টায় ৮ কিমি বেগে সাইকেল চালানো	৫	৩০০
অপ্রযোগিতামূলক ব্যাডমিন্টন খেলা	৫.২	৩১২
বাগানে কাজ করা	৫.৬	৩৩৬
ঘণ্টায় ৫.৬ কি মি বেগে হাঁটা	৫.৬	৩৩৬
দ্রুততালে নাচা	৫.৭	৩৪২
টেবিল টেনিস খেলা	৬	৩৬০
অপ্রতিযোগিতামূলক সাঁতার কাটা	৬	৩৬০
চাষের কাজ করা	৬.৭	৪০২
বোলিং	৭	৪২০
সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামা	৭.১	৪২৬
প্রতিযোগিতামূলক ব্যাডমিন্টন খেলা	১০	৬০০
ঘণ্টায় ৮ কিমি বেগে জগিং করা	১০	৬০০
জুডো ও ক্যারাটে	১৩	৭৮০
সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠা	১৫	৯০০
প্রতিযোগিতামূলক স্কেটিং	১৫	৯০০
ঘণ্টায় ২৪ কিমি বেগে সাইকেল চালানো	১৫	৯০০

অ্যারোবিক ব্যায়ামের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন —১) আরামদায়ক ভালোভাবে ফিট করা স্পোর্টস জুতো। ২) শরীরের, বিশেষ করে নিম্নাঙ্গের অস্থিসন্ধি সুস্থ ও রোগমুক্ত থাকা। হাঁটুতে ব্যথা থাকলে সাঁতার অথবা সাঁতারে প্রশিক্ষণ না থাকলে কোমর জলে সুইমিং পুলে একনাগাড়ে হাঁটা চলতে পারে। ৩) অ্যারোবিক ব্যায়ামে প্রচুর ঘাম ঝরে বলে ব্যায়াম শুরুর করার আগে বেশ খানিকটা জল পান করে নিতে হবে। বিকালের দিকে ব্যায়াম করলে ও ঐ সময় খিদে থাকলে ফল খেয়ে ব্যায়াম শুরু করুন।

আইসোমেট্রিক ব্যায়াম — প্রাথমিক প্রয়োজনের অ্যারোবিক ব্যায়ামের উপযুক্ত পেশী বজায় রাখার জন্য অল্প কিছু আইসোমেট্রিক ব্যায়াম করা দরকার। ৫-১০ কিলোগ্রাম ওজনের ডাম্বেল বা সমমাত্রার যন্ত্রনির্ভর ব্যায়াম করা যেতে পারে। যন্ত্রের ব্যবহার না করতে চাইলে বুকডন অথবা মাথার উপরের আনুভূমিক লোহার রড থেকে ঝোলা যেতে পারে।

উমা

জাগো গ্রাহক জাগো (২য় পর্ব)

সবাই গোপাল, অতএব হরো হরো

মুকুল বিশ্বাস

মুদিখানা বা মণিহারি দোকান, দাঁড়িপাল্লার দিন গিয়েছে। ছোট এক যন্ত্র। ওপরে জিনিস চাপালেই গায়ের পর্দায় সবুজ অক্ষরে ফুটে উঠছে পরিমাপ। নিখুঁত। খদ্দের মহা খুশি। দোকানদার দশমিকের ঘরের পর দু-তিন বেশি দিয়েছে! আমরা বিশ্বাস করি — ছাপার অক্ষর কখনও মিথ্যা বলে না। এক্ষেত্রেও তাই। পর্দায় ফুটে ওঠা মাপ খাঁটি না হয়েই যায় না; পাঁচজন এমনই মানেন। আগের কিস্তিতে বলা হয়েছে দাঁড়িপাল্লার কথা। এবারে ইলেকট্রনিক ওজনযন্ত্র, যা যুধিষ্ঠিরের যন্ত্র-রূপ! সত্যনিষ্ঠ যুধিষ্ঠির যেমন মিথ্যা বলতে পারতেন, এই যন্ত্রও পারে। কিন্তু তা ধরার উপায় ও সাধ্য কোনোটাই নেই ক্রেতার। যাদের ওপর তা ন্যস্ত, তারা উদাসীন বললে কম বলা হয় কারণ বেশির ভাগ রাজ্যে, আমাদের রাজ্য সহ, তাদের প্রত্যক্ষ মদতেই এই ওজনযন্ত্র লোক ঠকানোর যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। ব্যাপারটি সামান্য জটিল বলেই আগের পর্বে বলা যায় নি। ওজন মাপা যায় মোটামুটি দু-ভাবে—

১) **যান্ত্রিক**: সরাসরি পৃথিবীর আকর্ষণ বল লিভারের সাহায্যে তুলনা করে। যেমন কাঁটা-বাটখাড়া বা স্টিল-ইয়ার্ড বা ঘড়ির মতো ডায়াল যন্ত্রে (খেয়াল করলে মনে পড়বে, শেষ দু-ধরনের যন্ত্র অনেক রেলস্টেশনে দেখেছেন)

২) **বৈদ্যুতিন**: যাতে লিভারের সাহায্য নিয়ে বা না নিয়ে জানা ওজন দ্বারা এক বিশেষ ধরনের কোষে (Load cell) পীড়নের (Strain) ফলে উদ্ভূত বিকৃতিকে রোধের বা প্রবাহমাত্রার বিকৃতিতে বদলে (যা ওজনের সমানুপাতি) শেষ পর্যন্ত তড়িৎ প্রবাহমাত্রা, বিভব বা কম্পাঙ্কের পরিবর্তনে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে অজানা ওজনের ফলে উদ্ভূত বিকৃতিকে জানা ওজনের জন্য বিকৃতির সঙ্গে তুলনা করে অজানা বস্তুর ওজন বার করা হয়। এই প্রযুক্তির মধ্যে D-Technology : Strain Gauges, F-Technology : Frequency-modulated force measurement and k-Technology : Electro-magnetic force compensation প্রধান।

এই বৈদ্যুতিন যন্ত্রেরও অনেক শ্রেণী বিভাগ আছে। সাধারণ মুদিখানা, সব্জি, লোহা ইত্যাদির বা গহনার দোকানে, লরি বা ট্রাক (স্থির বা চলমান) ওজনের জন্য বা রেলের মালগাড়ি (স্থির বা চলমান)ওয়াগনের ও পুরো গাড়ির ওজনের জন্যেও বৈদ্যুতিন ওজনযন্ত্রের ব্যবহার থাকলেও প্রথম কয়েক ধরনের দোকানে এর ব্যবহার ব্যাপক, তাই এখানে ব্যবহৃত ওজনযন্ত্রের কথাই আগে বলি। এগুলিকে যেসব নিয়ম-কানুন মেনে তৈরি হতে হবে তার বিশদ বিবরণ— Legal Metrology (General) Rules 2011 এর Seventh schedule - Non-automatic Weighing Instruments under Heading A Part I & Part II- [THE GEZZETE OF INDIA EXTRAORDINARY Part II sec 3 (i) এর ৩৮০ থেকে Part I ও ৩৮৬ থেকে Part II পাবেন। সাধারণভাবে এদের ডিজিট্যাল ওজনযন্ত্র (Digital Non-automatic Weighing Instruments) বলে। এইসব ওজনযন্ত্রের নিচে ২-৪টি লোডসেল (Load Cell) লাগানো থাকে যেগুলো ওজনের জন্য বিকৃত হয় এবং ঐ বিকৃতিকে বৈদ্যুতিন কারিগরির সাহায্যে ডিজিট্যাল আউটপুট হিসাবে পরিবর্তিত করে লাল বা সবুজ এল ই ডি (Light Emitting Diode) যুক্ত ইন্ডিকেটরে দেখান হয়।

যেহেতু এইসব যন্ত্রে মুদির দোকানে ০০ গ্রাম বা ১/২/৫ গ্রাম পর্যন্ত দেখায় যা আগেকার লোহার/পিতলের কাঁটায় দেখা বা বোঝা যেত না। অন্যদিকে সোনার দোকানের এই সব যন্ত্রে সাধারণত ১০মিলিগ্রাম পর্যন্ত দেখায়, যা আগেকার পিতলের নিক্তিতে দেখা বা বোঝা যেত না। তাই ডিজিট্যাল ওজন যন্ত্রগুলো দারুন ভাল ও বিশ্বাসযোগ্য —সাধারণ মানুষের মধ্যে এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছে, যা আসলে ভ্রম। চমকে যাবেন না, যদি বলি বেশির ভাগ মুদির দোকানের এইসব যন্ত্রে প্রতি ৫ কিলোগ্রামে অন্তত ১০ গ্রাম ও সোনার দোকানের প্রতি ওজনে বেচারামে ও কেনারামে অন্তত ২০ মিলিগ্রাম যথাক্রমে কম ও বেশি থাকে। যদিও ইচ্ছা করলেই ঠকানোর পরিমাণ বাড়ানো দু-এক মিনিটের রীতিমতো বৈজ্ঞানিক খেলা —পুরোনো আমলের ঠোকাঠুকি trial and error করার পদ্ধতি নয়। আর এই খেলার ছলে ঠকাতে পারার পিছনে যাঁদের অবদান সবচেয়ে বেশি তাঁরা হলেন ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের অধীনে ওজন ও পরিমাপ আধিকারিকরা।

ডিজিট্যাল ওজন যন্ত্রগুলো কেমন করে, কী দিয়ে তৈরি হবে তার বিশদ বিবরণ লিগ্যাল মেট্রোলজির সাধারণ নিয়ম ২০১১-র ৭ম তফশিলে দেওয়া আছে। এরই ১৩নং নিয়মে (ঐ গেজেটের ৩২০ পাতায় দেখুন) পরিষ্কার বলা আছে— সপ্তম তফশিলে যেমন বলা আছে, হুবহু তেমন ভাবেই এই সকল ওজন যন্ত্রগুলো তৈরি হতে হবে। [...shall conform, as regards physical characteristics configuration, constructional details, materials,

performance, tolerances and such other details to the corresponding specifications laid down for such weighing instruments in Seventh Schedule...] ও West Bengal Legal Metrology (Enforcement) Rules 2011 (যা দেখে ইন্সপেক্টর মশাইরা ভিন্ন ভিন্ন ওজন, ওজন যন্ত্র, পরিমাপ এবং পরিমাপ যন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন ফি নেন) এর Rule 8-এও একই কথা বলা আছে এবং এই সকল ওজন যন্ত্রগুলো কী ভাবে পরীক্ষা করতে হবে, তারও বিশদ বিবরণ ঐ Legal Metrology (general) Rules 2011 এর Seventh Schedule-এ দেওয়া আছে। চমকে যাওয়ার মতো কথা এই যে, বাজারের ডিজিট্যাল ওজন যন্ত্রগুলো সপ্তম তফসিলে যেমন বলা আছে, হুবহু তেমন ভাবে তৈরি না হলে তা মান-অনুযায়ী নয় এবং প্রকৃতপক্ষে বেআইনি। কাঠের দাঁড়িপাল্লার গোত্রীয় হওয়া সত্ত্বেও ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের অধীনে ওজন ও পরিমাপ আধিকারিকরা, ইন্সপেক্টরমশাইরা, তাতে ঠিক আছে বলে ছাপ ও সার্টিফিকেট দিয়ে দিচ্ছেন, যা পরিমাপ আইন ২০০৯-এর ৪৩ ধারা মতে জেল হওয়ার মতো অপরাধ। আর তাতেই এই ঠকার বাড়বাড়ন্ত! খুব বিশদ ভাবে না বললেও নীচের কয়েকটি না বললেই নয় কারণ যাঁরা Legal Metrology (general) Rules 2011 [এটি (Standards of weights & measures general) Rules 1985-এর অত্যন্ত সামান্য পরিবর্তিত রূপ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হল এটি প্রায় ১০০% আন্তর্জাতিক ওজন ও পরিমাপ সংস্থা OIML (Organisation Internationale de Me'troligie Le'gale)-এর নিয়মাবলীর প্রায় হুবহু নকল] তৈরি করেছেন তাঁরা গ্রাহকদের কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু যাঁদের দায়িত্ব ঠিক মতো তৈরি হয়েছে কিনা বা ব্যবহার হচ্ছে কিনা পরীক্ষা করে নিয়ম বলবৎ করার, তাঁরা তা না করাতেই গ্রাহকদের আজ এই দুরবস্থা। জেনে রাখা ভাল, ঐ দপ্তরে শুধু বলবৎকরণের জন্যই বেশ বড় একটি শাখা (এনফোর্সমেন্ট উইং) বড় ছোট আধিকারিক নিয়ে, আছে।

ঐ রুলের গেজেটের ৩৯১ পাতায় para 4-এর 1(ii)তে লেখা আছে ওজন যন্ত্রগুলোতে কোনো ঠকানোর ব্যবস্থা থাকবে না।...ii) Security ...Fraudulent use - An instrument shall have no characteristics likely to facilitate its fraudulent use...। কিন্তু বর্তমানে ৯৯% যন্ত্রে তা আছে। ওজন কমানো-বাড়ানোর এই খেলা একজন সহ-নিয়ামক মহাশয় বহুদিন আগে কোনো টিভি চ্যানেলে দেখিয়েও ছিলেন কিন্তু কেউ কান দেন নি।

আগেই বলা হয়েছে বৈদ্যুতিন ওজন যন্ত্রগুলোতে ওজনকে তড়িৎ প্রবাহমাত্রা, বিভব বা কম্পাঙ্কের তুলনা করে বার করা হয়। এটা করার জন্য বৈদ্যুতিন ওজন যন্ত্রটির উপর কোনো ওজন চাপিয়ে সেটা কত ওজন হল তা ওজন যন্ত্রটি মনে রাখতে বলা হয় —একেই সাধারণভাবে বলা হয় Calibrate করা। এর ফলে ঐ ওজন যন্ত্রটির উপর কোনো জিনিস রাখলে ওজন যন্ত্রটি ঐ জিনিসটি যে ওজন দিয়ে তাকে Calibrate করা হয়েছে তার কত গুণ/ভাগ তা বলে দেয়। ধরা যাক ১৯০০ গ্রামকে ২ কিলোগ্রাম বলে কোনো ওজন যন্ত্রকে Calibrate করা হল তা হলে ঐ ওজন যন্ত্রটি ৩৮০০ গ্রামের কোনো বস্তুকে ৪ কিলোগ্রাম এবং ৯৫০ গ্রামের বস্তুকে ১ কিলোগ্রাম দেখাবে এবং Calibration করার জন্য মাত্র ২/৩ মিনিটই অনেক ক্ষেত্রে যথেষ্ট। কি করে Calibration করা হয় তার ছক নিচে দেওয়া হল (ইচ্ছে করেই হুবহু দেওয়া হল না)। বিভিন্ন কোম্পানির জন্য বিভিন্ন পাসওয়ার্ড বা কারিকুরি বিভিন্ন হলেও পার্থক্য অত্যন্ত সামান্য। সবচেয়ে ভয়ংকর কথা ওজন যন্ত্রের ম্যানুয়াল যা ওজনযন্ত্রের সঙ্গেই দেওয়া হয় তাতেই এই Calibration করার পদ্ধতিটি দেওয়া থাকে। (**একটি কোম্পানির ওজনযন্ত্রের ম্যানুয়াল-এ দেওয়া Calibration করার পদ্ধতিটি প্রমাণ হিসেবে দেওয়া হল**।) যে সব বেকার ছেলেরা অথবা তথাকথিত এজেন্টরা (এটাও বেআইনি) ওজনযন্ত্রটি বিক্রি করে ডেলিভারির সময় ঐ আধ পাতা অংশ কেটে নেয় যাতে সে পরে ঐ কোম্পানির ঐ ধরনের ওজনযন্ত্র আবার নিজে Calibrate করতে পারে —অবশ্যই বিক্রেতার ইচ্ছা মতো বা টাকার বিনিময়ে বিক্রি করতে পারে ঐ আধপাতা অংশ।

Tare, Mode, M+ ও MR এই ৪টি বোতাম এবং ওজনযন্ত্রের তলার অন/অফ সুইচ-এর সাহায্যেই Calibration সহ যাবতীয় তথ্য যেমন —নির্মাতার নাম, parameter ইত্যাদি সবই বদল করা সম্ভব। প্রথমে উপরের ৪টির বিশেষ ১টি/২টি বা ৩টি বোতাম একসঙ্গে টিপে সুইচ অন করলেই যন্ত্র পাসওয়ার্ড বা CAL অর্থাৎ Calibration চায়। এরপর যেমন প্রয়োজন কয়েক (২/৩) ধাপে Calibration বা খোল-নলচে বদল করে নেওয়া হয়।

এর থেকে সিদ্ধান্তে আসাই যায় এই সব ওজনযন্ত্রে characteristics likely to facilitate its fraudulent use... থাকায় ৪নং অনুচ্ছেদের বিধি না মেনে তৈরি, ফলে আগে বলা ১৩নং বিধি না মেনে তৈরি, তাই নন-স্ট্যান্ডার্ড এবং ৮নং বিধি অনুসারেও এগুলি স্ট্যাম্পিং-এর যোগ্য নয়। করলে তা লিগ্যাল মেট্রোলজি অ্যাক্ট ২০০৯-এর ৪৩ ধারা মতে জেল হওয়ার মতো শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কিন্তু পাঠক একটু খোঁজ নিয়ে দেখুন অবস্থাটা কি ভয়ংকর। কারণ শতকরা ৯৯ জনই সঠিক ব্যাপারটি পুরোপুরি জানেন না বা প্রতিবাদ করেন না বা বলতে পারি গ্রাহক জেগে নেই।

শুধু তাই নয় এবার আসব আরও একটি জায়গায় যার জন্য কোনো কঠিন পরীক্ষা না করে শুধু দেখেই বলা যায় এই সব ওজনযন্ত্র ১৩নং বিধি না মেনে তৈরি, তাই নন-স্ট্যান্ডার্ড এবং এই রাজ্যের ৮ বিধি অনুসারেও এগুলি স্ট্যাম্পিং-এর যোগ্য নয়। ৪০৬ পাতায় 7,(1) (iii)c. fixing অনুচ্ছেদে বলা আছে যে একটি রিভেট বা ক্যাপ ৪ মিমি ব্যাস-এর স্ট্যাম্প নিতে পারে এমন একটি রেডকপার বা ঐ রকম ধাতুর হতে হবে অর্থাৎ তৈরির পর

স্ট্যাম্প করে সব ঘোষণা যুক্তটিকে এমনভাবে রিভেট করা হবে বা ঢাকা দেওয়া স্ক্রু দিয়ে আঁটা থাকবে যাতে প্লেটটি কেউ বদলাতে না পারে। এবার লিগ্যাল মেট্রোলজি (জেনারেল) রুলস ২০১১-এর গেজেটের ৪০৭ পাতায় ৭ (২) অনুচ্ছেদে ভেরিফিকেশন মার্ক কোথায় থাকবে এবং কেমন ভাবে থাকবে তার স্পষ্ট নির্দেশ হিসেবে বলা আছে ভেরিফিকেশন মার্ক নষ্ট না করে তাকে নড়ানো যাবে না। ভেরিফিকেশন মার্ক এমন ভাবে থাকে যে পপ-আপ রিভেট ভেতর থেকে কেটে সীসার সিল প্লেট থেকে খুলে pop-up riveter যন্ত্রটির সাহায্যে স্ট্যাম্পটি অন্য কোনোযন্ত্রে ভেরিফিকেশন মার্ক নষ্ট না করেও লাগান যাবে। pop-up riveter এমন কিছু দামি যন্ত্র নয় মাত্র ২০০-২৫০ টাকা দাম। এবার নিশ্চয়ই স্পষ্ট এইসব ওজনযন্ত্র ১৩নং বিধি না মেনে তৈরি, তাই নন-স্ট্যান্ডার্ড এবং এই রাজ্যের ৮ বিধি অনুসারেও এগুলি স্ট্যাম্পিং-এর যোগ্য নয়। যারা স্ট্যাম্পিং করছেন তারা জেলযোগ্য অপরাধ করছেন।

কেউ কেউ বলেন সরকারি ফি তোলার জন্যই নাকি এই সব ওজনযন্ত্র স্ট্যাম্প করা হয়। কথাটা ডাহা মিথ্যা তা বোধ হয় বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ ঐ রকম স্ট্যাম্প করা সব ঘোষণা যুক্ত প্লেটটি ঐ ধরনের অন্য যন্ত্রে pop-up riveter যন্ত্রটির সাহায্যে স্ট্যাম্পটি সহ অন্য কোনো যন্ত্রে ভেরিফিকেশন মার্ক নষ্ট না করেও লাগান যাবে যার ফি সরকার পাবে না। শুধু তাই নয় যেহেতু ইন্সপেক্টরের পরিচয়ের স্ট্যাম্প অস্পষ্ট তাই জাল স্ট্যাম্প লাগিয়ে জেরক্স করা সার্টিফিকেট সঙ্গে দিয়ে আসল স্ট্যাম্প বলে একই নম্বরের ওজনযন্ত্র রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় পাঠালেও বোঝা যায় না। সরকার পায় একটির, বাকিগুলির ফি অবশ্যই ভাগাভাগি হয়। আর ঠকে ক্রেতারা। এ ছাড়াও আছে —স্ট্যাম্প করার পরে ওজনযন্ত্রের কোনো অংশ যাতে খুলে বা বদলিয়ে যন্ত্রে যাতে কারিকুরি না করা যায় তাই তা আলাদা ভাবে সিল করতে হবে ৮নং অনুচ্ছেদে আছে কিন্তু ৯৯% ওজনযন্ত্রেই সিল দেখতে পাবেন না। এগুলো বাইরে থেকেই কারিকুরি করা যায় তাই সিল করাও অর্থহীন। যদিও বহু রাজ্যে সিলিং আছে কিন্তু যন্ত্রগুলি যথারীতি বিধিসম্মত কি না তা দেখার দরকার আছে।

এবার আসব ওজনযন্ত্র পরীক্ষা করার পদ্ধতিতে যা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রতারণার নামান্তর, তাও নাকি কেউ কেউ বলেন সরকারি ফি তোলার জন্যই এবং সরকারের ইচ্ছায়ই এই অবস্থা। ওজন, ওজনযন্ত্র, পরিমাপ ও পরিমাপযন্ত্রদের একসঙ্গে ওজন ও পরিমাপ বলে। ব্যবসায় বা সুরক্ষায় ব্যবহৃত ওজন ও পরিমাপ প্রথমবার ব্যবহারের আগে পরীক্ষা করে উপযুক্ত প্রমাণ হলে স্ট্যাম্প করে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়, এরপর সাধারণ কাঁটা-বাটখাড়া প্রতি ২ বৎসরে একবার এবং অন্যান্য ওজন ও পরিমাপ প্রতি বৎসর উপযুক্ত ফি দিয়ে পুনঃপরীক্ষণ করা রাজ্যের নিয়ম ওয়েস্ট বেঙ্গল লিগ্যাল মেট্রোলজি (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০১১ ও লিগ্যাল মেট্রোলজি (জেনারেল) রুলস ২০১১ অনুযায়ী বাধ্যতামূলক। এমনকি যে ওজন ও পরিমাপ যন্ত্র ইন্সপেক্টরের ল্যাবরেটরিতে থাকে এবং যা দিয়ে তাঁরা ব্যবসায় বা সুরক্ষায় ব্যবহৃত ওজন ও পরিমাপ পরীক্ষা করার কথা, ইন্সপেক্টদের সেই ওয়ার্কিং স্ট্যান্ডার্ড ওজন ও পরিমাপও প্রতি বৎসর উপযুক্ত ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে উপযুক্ত প্রমাণ হলে স্ট্যাম্প করে সার্টিফিকেট নেওয়ার কথা নতুবা ইন্সপেক্টরদেরও ব্যবসায় বা সুরক্ষায় ব্যবহৃত ওজন ও পরিমাপ পরীক্ষা করার ক্ষমতা থাকার কথা নয়। (ওয়েস্ট বেঙ্গল লিগ্যাল মেট্রোলজি (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০১১-এর রুল সহ লিগ্যাল মেট্রোলজি (জেনারেল) রুলস ২০১১ এবং লিগ্যাল মেট্রোলজি (ন্যাশনাল স্ট্যান্টার্ডস্) রুল ২০১১, ৩১)। যতদূর খবর সেই ওয়ার্কিং স্ট্যান্ডার্ড ওজন ও পরিমাপও প্রতি বৎসর দূরে থাকুক এক দশকের উপরে উপযুক্ত ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে উপযুক্ত প্রমাণ করে স্ট্যাম্প করান নেই প্রায় সারা পশ্চিমবঙ্গের ইন্সপেক্টরের। পাঠক তথ্যের অধিকার আইনের সাহায্যে তথ্যটির সত্য-মিথা যাচাই করে দেখতে পারেন। বেশ কয়েক বছর আগে ওয়ার্কিং স্ট্যান্ডার্ড ওজনযন্ত্র বলে বেশি দাম দিয়ে কিছু বাজারের সাধারণ ইলেকট্রনিক যন্ত্র লিগ্যাল মেট্রোলজি ডিরেক্টরেট কিনেছিল যা আদপেই তা নয় এবং সেগুলো ব্যবহারেরও যোগ্য নয়। প্রাক্তন এক অভিজ্ঞ সহ-নিয়ামক মহাশয় এই ব্যাপারে শুনেছি দপ্তরেও জানিয়েছেন।

কেউ কেউ বলেন ওয়েস্ট বেঙ্গল লিগ্যাল মেট্রোলজি (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০১১-এর ২১ (৪) ধারায় খারাপ ওজনযন্ত্র দিয়ে ক্রেতাদের ওজনে ঠকানো রোধের ব্যবস্থা আছে, কারণ সেখানে বলা আছে ওজনযন্ত্রের কাছে ওজনযন্ত্রের ক্ষমতার ১০% বা ১ মেট্রিক টন যেটা কম ততটা পরীক্ষিত বাটখাড়া থাকতে হবে যাতে ক্রেতা ঐ বাটখাড়া চাপিয়ে ওজনযন্ত্র সঠিক কিনা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। গ্রাহক-পাঠকদের বেশিরভাগই এই নিয়মের অস্তিত্ব জানেন না, এই নিয়মের প্রচার নেই। গ্রাহক-পাঠকদের শাস্তি দেওয়ার সরাসরি কোনও আইনি ক্ষমতা নেই। এই বিধিভঙ্গের জন্য শাস্তির পরিমাণ নগণ্য যদিও সংখ্যা বিপুল, তাই ইন্সপেক্টররাও এই বিধিভঙ্গ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া দেখেও দেখেন না। এরও পর আছে! বুদ্ধিমান ব্যবহারকারি বাটখাড়ায় সামান্য কারিকুরি করলেই ক্রেতাদের ধরার ক্ষমতার মধ্যের সব ত্রুটি ভোঁভাঁ। সোনার দোকানে সর্বত্র তাই করা হয়। তাই যদি আইন কানুন মতো সঠিক ভাবে দেখে ওজনযন্ত্রগুলো স্ট্যাম্প হয় তবেই ক্রেতারা রেহাই পেতে পারেন নতুবা নয়। ২১ (৪) ধারা তখন কাজে লাগতেও পারে।

এবার আসি এই ধরনের ওজনযন্ত্রের প্রথমবার পরীক্ষার কথায় — যতগুলো পরীক্ষার কথা বলা আছে ৮নং অনুচ্ছেদে তার

প্রথমটিতেই ৮ (১) (i) বলা আছে খালি চোখে দেখে নিতে হবে প্লেটটি ঘোষণা সহ ঠিক মতো আটকান আছে কিনা, বা স্ট্যাম্প লাগানর জন্য ব্যবস্থা ঠিক মতো আছে কিনা, তারপর অন্যান্য পরীক্ষাগুলো (অন্তত ৪টি) করতেই হবে। অন্যান্য পরীক্ষাগুলোর মধ্যে একটির জন্য (Creep test) ৪ ঘণ্টা লাগতে পারে (কিন্তু কখনই ৩০ মিনিটের কম নয়) ও অন্য একটির জন্য আধঘণ্টা (Zero return test) অবশ্যই লাগার কথা। কিন্তু সরকারের (?) কথা ভেবে ২/৪ ঘণ্টায় ২৫-৫০টি ওজনযন্ত্রের পরীক্ষাগুলো ইন্সপেক্টররা সেরে ফেলেন। অবশ্যই খালি চোখে দেখে নেওয়াটি বাদ দিয়ে। কারণ ঠিকমত দেখলেই সবগুলোর প্লেটই ঠিকমতো না লাগানো থাকার জন্য ওজনযন্ত্রগুলি বাতিল হওয়ার কথা।

এবার আসি এক বৎসরের ব্যবহারের পর পুনঃপরীক্ষণের কথায়। কোনও কোনও ইন্সপেক্টররা দিনে ২০-২৫টি বা তারও বেশি এই রকম ওজনযন্ত্র অনায়াসে করে ফেলেন। কেউ কেউ এক দিনে এই রকম ওজনযন্ত্রের কাঁটা-বাটখাড়া (শতাধিক) ক্যাম্প জাতীয় জায়গায় বহু ব্যবসায়ীদের ডেকে তাদের ওজন ও পরিমাপ পরীক্ষা করার ক্ষেত্রে আরও বেশি। প্রতিটি দেখতে গড়ে অন্তত ২ মিনিট সময় লাগলেও ডিজেল-পেট্রল দেওয়ার যন্ত্র এমনকি চলমান মালগাড়ি মাপার ১০০ টন যন্ত্রও পরীক্ষা করে ফেলেন। (যার একটি গোটা একদিনেও নিয়মমত করা প্রায় অসম্ভব তারও দুটো এমনকি এর সঙ্গে লরি মাপার যন্ত্রও করেছেন তার নিদর্শন আছে)। অনেক ইন্সপেক্টররাই ইদানিং সরকারের (!!) কথা ভেবেই রোজই অফিসের কাজ করেন শনি, রবি বা অন্যান্য ছুটির দিনেও এবং কাঁটা-বাটখাড়া (শতাধিক) না দেখেই মেরামতকারকদের (যারা ১৫০০ মিলিগ্রামের ত্রুটিযুক্ত কাঁটা দিয়ে ১৫০ মিলিগ্রাম পর্যন্ত ত্রুটির বাটখাড়াও অনায়াসে বুঝে সারাতে পারেন) উপর ভরসা করে ছাপ দিয়ে দেন। শোনা যায় কোনও এক ইন্সপেক্টর লিখে জানিয়েছিলেন দৌড়াদৌড়ি, টাকার রসিদ ও অত সার্টিফিকেট লেখার পর বাটখাড়া বা ওজনযন্ত্রাদি পরীক্ষা করার সময় থাকে না। তাই মেরামতকারকরাই ভরসা। আগেই বলেছি ইন্সপেক্টরদের নিজেদের ওজনযন্ত্রগুলোই এক দশক পরীক্ষা হয় নি, মেরামতকারকদেরগুলোর সূক্ষ্মতা উপযুক্ত নয় তার উপরে পরীক্ষার বহরের কথা জেনে গ্রাহকদের বোঝার অসুবিধা হবার কথা নয়। লিগ্যাল মেট্রোলজি ডিরেক্টরেট-এ যা চলছে তা প্রহসনেরও অধম। শুধু তাই নয় নিজেদেরগুলি সময় মতো (প্রতি বৎসরের জায়গায় দশ বৎসরেও নয়) না হলেও ব্যবসায়ীদেরগুলি ২/৪ মাস দেরি হলেই সেগুলো seize করে কেউ কেউ ভুল ধারায় ৫০০ টাকার বদলে ৩০০০-৪০০০ টাকা compunding fees আদায় করেন -বিভিন্নভাবে ভয় দেখিয়ে। শুধু নাকি সরকারের (!) কথা ভেবেই। যা মিথ্যা ও প্রতারণার নামান্তর মাত্র। ইন্সপেক্টরদের ও তার উপরওয়ালাদের কৃপায় যে সব পেট্রল বা ডিজেল দেওয়ার যন্ত্র। যেমন Z-pump বা অন্য যান্ত্রিক পাম্প। যা বর্তমান আইনে বাতিল তাও মিথ্যাভাবে লিখে ছাপ দিয়ে বৈধ বলা হয়। পেট্রল বা ডিজেলবাহী ট্যাঙ্কারে যে পিতলের প্লেট রিভেট করে লাগান বাধ্যতামূলক তা লাগান হয় না, যার ফলে তেলকাটা ব্যবসা অনেক সহজ হয় কারণ সহজেই অনুমেয়। বর্তমান সরকারের ঊর্ধতন মহল নিশ্চয়ই এত খুঁটিনাটি জানেন না এবং তাঁদের জানানোও হয় না বরং ভুল তত্ত্ব ও তথ্য সরবরাহ করা হয়। তাঁরা নিশ্চয়ই এসব চান না। সুতরাং তাঁদের পুরো অবস্থা জানালে অবশ্যই এর একটা বিহিত করার চেষ্টা তাঁরা করতেন। বেশির ভাগই ডিরেক্টরেট-এর কল্যাণে হয়, তার সঙ্গে আছে আগের সরকারের লিগ্যাসি।

গুজরাট, অন্ধ্রপ্রদেশ সহ বেশ কিছু রাজ্যে কুটিরশিল্পের মতো যন্ত্রের খোল ও আলাদাভাবে পিসিবি-তে চিপ্ আটকানো হচ্ছে, ঐগুলি এনে খোলে ভরে ইচ্ছামত কোম্পানির নামের ও শ্রেণীর বৈশিষ্ট্যের স্টিকার লাগালেই যন্ত্র তৈরি। আইনে এই রকম ভিন্ন ভিন্ন অংশ এনে জুড়ে যন্ত্র প্রস্তুতের বিধানও আছে প্রস্তুতকারকদের জন্য লিগ্যাল মেট্রোলজি অ্যাক্ট ২০০৯ sec2f (iii) দেখুন।

তাই শুধু সরকার চাইলেই বা বিজ্ঞাপন দিলেই এই ঠকানোর হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যাবে না গ্রাহকদের নিজেদের স্বার্থেই জানতে হবে খুঁটিনাটি। ইনটারনেটের যুগে মাউস ক্লিক করেই বহু তথ্য পেয়ে যাবেন। রাষ্ট্রীয় আইনগুলো দেখুন www.fcamin.ac.in, -Consumer Affairs -Legal Metrology এবং বিশদভাবে একটি কোম্পানির ওজনযন্ত্রের calibration এর জন্য দেখুন www.fcamin. advpro_cs_pioneer_ scoutpro_ ya.pdf। লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন যন্ত্রে যে কেউ যাতে না calibration বদল করতে পারে তা বন্ধ করার ব্যবস্থা আছে, সব যন্ত্রেই থাকার কথা, কিন্তু আমরা যে সব ওজনযন্ত্রের ব্যবহার দেখি তাতে এটি রাখা নেই—তবুও তাদের উপযুক্ত বলে ছাড়পত্র দিয়ে দেওয়া হয়!!

উমা

পাঠকদের কাছে আবেদন

আমরা অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাপত্র নিয়ে একটি বই প্রকাশ করতে চলেছি। এই কাজের শুরু হিসাবে ইতিমধ্যেই অন্য পত্রপত্রিকায় ছাপা লেখা আমাদের পত্রিকায় ছাপা হচ্ছে। তার বাইরেও রয়েছে অনেক। কারও কাছে তেমন লেখা বা চিঠিপত্র থাকলে আমাদের দিতে পারেন। বইতে সঙ্কলিত হতে পারে। — পরিচালকমণ্ডলী

স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অসুখ-বিসুখ

সঞ্জীবকুমার মুখোপাধ্যায়

চোখে দেখা- কানে শোনা
শুধু বসে থেকে দিন গোনা...

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা। বিজ্ঞান ও কারিগরি উন্নতি। দায়িত্ব কার? রাষ্ট্রের না ব্যক্তির?

কথার মারপ্যাঁচে না গিয়ে কিছু ঘটনার উল্লেখ দিয়ে শুরু করা যাক —পরে না হয় 'প্রবাহ' চলতে পারে।

ঘটনা ১

মেদিনীপুরের এক ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র। সদ্য নিয়োগ- হওয়া মহিলা ডাক্তারবাবু (স্ত্রী রোগ বিদ্যার ডিপ্লোমাও আছে)। রাতে হঠাৎ গর্ভপাতজনিত কারণে সাঙ্ঘাতিক রক্তপাতে কাহিল এক মহিলাকে পরীক্ষা করে, উপস্থিত নার্স দিদিমণিকে বললেন, এখুনি এঁকে 'ওয়াশ' করা দরকার। সামান্য কিছু জিনিসপত্র ও সরঞ্জাম লাগবে। তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করা হোক। নার্স দিদিমণি অনেকদিন আছেন চাকরিতে। শুনে আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন—কখনোই এই 'কেস' এখানে করা যাবে না। তিনি একা আছেন ডিউটিতে। সরঞ্জামও ঠিকঠাক নেই। তাছাড়া একবার 'পাবলিক' যদি জানতে পারে, এইসব কেস এখানে হচ্ছে, ভিড়ের ঠেলায় নাওয়া-খাওয়ার সময় থাকবে না! তার চেয়ে একে 'রেফার' করে দেওয়া হোক জেলা সদরে, সদর হাসপাতালে, যার নাম আরও সব জেলা হাসপাতালের মতো বদলে করা হয়েছে 'মেডিক্যাল কলেজ'। ডাক্তারবাবু অসহায়। স্ত্রীরোগ বিদ্যায় পারদর্শী হওয়া সত্ত্বেও এই সামান্য একটু পরিষেবা দেওয়া গেল না, সামান্যতম পরিকাঠামোর অভাবে! অসহায় গরিব রোগিনীটিকে ভাড়া-করা অ্যাম্বুলেন্সে মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র লিখে দিয়ে, মন খারাপ নিয়ে বাসস্থানে ফিরে গেলেন। মনে মনে শুভ কামনা জানালেন, রুগী যেন ভাল থাকে।

কিন্তু আসল বিস্ময় অপেক্ষা করছিল পরদিন সকালে। স্থানীয় নার্সিংহোমের মালিক এলেন দেখা করতে। বিনীত ভঙ্গিতে খবর দিলেন, কাল রাত্রে সদরে রেফার করা রোগী তাঁর নার্সিংহোমে ভর্তি হন। তখনই নার্সিংহোমের ডাক্তারবাবু 'কেস'টি 'ওয়াশ' করে দেন। পরবর্তীকালে ডাক্তারবাবু যেন এই ধরনের কেস 'অহেতুক' সদরে না পাঠিয়ে তাঁর নার্সিংহোমেই পাঠিয়ে দেন। ডাক্তারদিদি নিজে গিয়েও 'কেস' করতে পারেন অথবা 'কেস' পাঠিয়ে কমিশন নিতে পারেন, সবই তাঁর ইচ্ছা!

ঘটনা ২

কলকাতার উপকণ্ঠ। বাইপাসের ধারের বস্তিতে মাথা গোঁজা এক যুবকের ৬৭ বছরের দিদিমা পড়ে গিয়ে হাত ভেঙেছেন। যুবক দিদিমাকে নিয়ে উপস্থিত বাইপাসের ধারে অবস্থিত এক পাঁচতারা হাসপাতালে। এক্স-রে করার পর দেখা যায়, হাতের হাড় ভেঙেছে। ডাক্তারবাবুর নিদান —অপারেশন করে প্লেট বসাতে হবে। এটাই নাকি আধুনিকতম, সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসা। খরচ কমপক্ষে পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার টাকা। কোথায় এত টাকা পাবে এই বাপ-মা হারা সামান্য উপায় করা যুবক? সে দিদিমাকে নিয়ে এইবার উপস্থিত দক্ষিণ কলকাতার এক সরকারি হাসপাতালে। সেখানে সে বলে ওই অপারেশনের কথা। সহৃদয় ডাক্তারবাবু বলেন, সামান্য (!) দশ-বারো হাজার টাকা খরচ করে এটা হতে পারে। কিন্তু দেড়মাসের আগে হওয়া সম্ভব নয়। লাইন দিয়ে আছে সব রুগী।

এক পরিচিত হাড়ের ডাক্তারবাবুর বাড়িতে সে কিছুদিন কাজ করেছিল। তাঁকে তার অসহায় অবস্থার কথা জানাতে ডাক্তারবাবু এক্স-রে প্লেট দেখে বলেন, ওইসব 'প্লেট-স্লেট' না বসিয়ে রোগীকে ঘুমের ইঞ্জেকশন দিয়ে অজ্ঞান করে ভাঙা হাড় 'সেট' করে দিয়ে প্লাস্টার করে দিলেই চলবে। হপ্তা তিনেক পরে 'চেক' এক্সরে করে প্লাস্টার খুলে দেওয়া যাবে। তিনি একটি ছোটখাটো নার্সিংহোমের সঙ্গে যুক্ত। সর্বমোট হাজার তিন-চার খরচা হবে। যুবক অনেক ভাবে। শেষে সিদ্ধান্ত নেয়, তার দিদিমার জন্য 'সর্বোৎকৃষ্ট' চিকিৎসার বন্দোবস্তই করবে। ওই ঝাঁ চকচকে হাসপাতালেই সে যায় — ধার দেনা করে, সম্পত্তি বন্ধক রেখে!

ঘটনা ৩

পশ্চিম মেদিনীপুরের জঙ্গল মহলের মহকুমা শহর। ব্যাঙের ছাতার মতো ডায়াগনস্টিক সেন্টার গজিয়েছে, বড় বড় প্রাইভেট নার্সিংহোম, হসপিট্যালও হয়েছে। সরকারি মহকুমা হাসপাতালটির সাইনবোর্ড পরিবর্তন হয়ে হয়েছে —জেলা হাসপাতাল। এগুলি উদ্বোধন করার জন্য প্রায়ই সাইরেন বাজানো গাড়ির উচ্চকিত আওয়াজে শহর সরগরম। গলায় মালা পরে বড়-মেজো ছোটো নেতারা এগুলিকেই 'স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি' হিসেবে চিহ্নিত করতে ব্যস্ত। এইসব প্রাইভেট জায়গায় বিভিন্ন ধরনের অত্যাধুনিক পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করা হয়। সেই রকম একটি বেসরকারি কেন্দ্র। সিটি স্ক্যান হয় সেখানে। এক আদিবাসী রমণীর

পেটে ব্যথা অনেক দিনের। ডাক্তারবাবু সিদ্ধান্ত নিলেন, এটা ওটা না করিয়ে একেবারে পেটের সি টি স্ক্যান করে নেওয়া যাক। সব মিলিয়ে দশ হাজার টাকা পড়বে। তা পড়ুক। গরু-ছাগলগুলো আছে বিক্রি করা যেতে পারে। বাড়ি, অল্প কিছু জমি আছে, বন্ধক রাখা যেতে পারে। বিরাট হোক, তবু সুদে ধারও নেওয়া যেতে পারে। সিটি স্ক্যান হল। সব ঠিক আছে। রোগ ধরা পড়ল না। রোগী বা তার বাড়ির লোকজন কিন্তু খুশি। সর্বস্বান্ত হয়ে গেলেও সর্বোৎকৃষ্ট পরীক্ষা হয়ে গেল, একেবারে ঘরের পাশেই। সিটি স্ক্যানের উপদেশ দেওয়া ডাক্তারবাবুও খুশি। তাঁর পকেটে কমিশন! কিন্তু পেটে ব্যথা যে কমে না! আরেক ডাক্তারবাবুর কাছে যাওয়া হল। গর্বিত গলায় সিটি স্ক্যানের বাহারি প্যাকেট ঝুলিয়ে। সেই চিকিৎসক মহিলাকে নিরীক্ষণ করে কৃমির ওষুধ দিলেন। আশ্চর্য পেটের ব্যথা উধাও!

সিটি স্ক্যান হল। সব ঠিক আছে। রোগ ধরা পড়ল না। রোগী বা তার বাড়ির লোকজন কিন্তু খুশি। সর্বস্বান্ত হয়ে গেলেও সর্বোৎকৃষ্ট পরীক্ষা হয়ে গেল, একেবারে ঘরের পাশেই। সিটি স্ক্যানের উপদেশ দেওয়া ডাক্তারবাবুও খুশি। তাঁর পকেটে কমিশন! কিন্তু পেটে ব্যথা যে কমে না!

ঘটনা ৪

পুরুলিয়ার এক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত এক হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারবাবুর কাজে যোগদান করার পর অপেক্ষা করে ছিল বিস্ময়ের পর বিস্ময়। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থাই সেখানে নেই। তাহলে তিনি কী করবেন? কর্তৃপক্ষ মৌখিক ভাবে জানিয়ে দেন —অ্যালোপ্যাথি ওষুধই যেন তিনি দেন। এটা আর কী এমন শক্ত কাজ? ব্যথা হলে ব্যথার বড়ি, পায়খানা বেশি হলে না হওয়ার বড়ি, বমি হলে বমির বড়ি। এই করে উপসর্গ ধরে ধরেই চিকিৎসার নিদান সবাই দিয়ে থাকেন। তা না হলে আর ৪ ঘণ্টায় ২৫০ রোগী তাড়ানো (ডিসপোজ) হবে কী করে! ডাক্তারবাবুটির একটিই খালি মুশকিল,তাঁর 'চেতনা' বলে একটি বস্তু মজ্জায় তখনো রয়ে গেছে। যদিও পুরাতন বরিষ্ঠ সহকর্মীরা বলে দিয়েছেন, কিছুদিনের মধ্যেই ওই 'রোগ' সেরে যাবে। যাই হোক, এ ব্যাপারে তাঁর অজ্ঞানতাজনিত অপারগতা প্রকাশ করায় প্রত্যেকেই বিরক্ত। এককালে শয্যার বন্দোবস্ত থাকলেও বর্তমানে খালি সকালে ৪ ঘণ্টার আউটডোর। সেখানেও রুগী দেখার ন্যূনতম ব্যবস্থা হিসাবে একটি রক্তচাপ মাপার যন্ত্র চেয়ে তিনি সবাইকার হাসির খোরাক হয়েছে।

অগত্যা আর কী করা?

'শুধু আসা যাওয়া আসা, শুধু স্রোতে ভাসা ...'।

উমা

সাক্ষরতা ও শিক্ষা একটি প্রস্তাব

বিবেক সেন

শিরোনামে একটি 'প্রস্তাব' না বলে সম্ভবত বলা সমীচীন হত একটি স্বপ্ন, আরও স্পষ্ট করে বললে একটি অলীক স্বপ্ন বা ইউটোপিয়া। তবে সব সৃষ্টির পিছনেই থাকে একটি স্বপ্ন। সেই স্বপ্নটাই জাগায় প্রেরণা, এগিয়ে চলার তাগিদ। তাই সব সংশয়কে সরিয়ে রেখে প্রস্তাবটা পেশ করাই যাক।

প্রস্তাবের রূপরেখা

সংকল্প: সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি ও শিক্ষার প্রসার

রূপায়ণে : অল্পসংখ্যক প্রবীণ নাগরিক, বয়স্ক কিন্তু সক্ষম

পুঁজি : সদিচ্ছা, উদ্যম, সহানুভূতি ও আত্মবিশ্বাস

অর্থ : অপ্রয়োজনীয় অথবা যৎসামান্য

পরিকাঠামো : স্কুলবাড়ি বা ক্লাবঘর, চণ্ডীমণ্ডপ বা কোনো সদাশয় ব্যক্তির আশ্রয়

কাজের এলাকা : বস্তি অঞ্চল, শ্রমিকদের আবাসন, দরিদ্র কৃষক বা শ্রমজীবীদের গ্রাম

কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

প্রবীণ নাগরিক কেন? : সংকল্পটি রূপায়ণে প্রবীণ নাগরিকদের এগিয়ে আসার আবেদন করা হয়েছে কেন, প্রথমে তার পক্ষে সওয়াল করা যাক। সবার পক্ষে প্রযোজ্য না হলেও অনেকেই কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর গ্রহণের পর মানসিক একাকিত্বের অবসাদে ভোগেন। সন্তানেরা অনেক সংসারেই কর্মসূত্রে বা অন্যান্য কারণে দূরবর্তী শহরে থাকেন। কাজেই কচি-কোমল নাতিনাতনিদের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে প্রবীণ নাগরিকদের অনেকেই পরিবার ও সমাজ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন বোধ করেন। এমন সময়ে কোনো গঠনমূলক কাজে যুক্ত হতে পারলে তিনি মানসিক ভারসাম্য হারাবেন না, সমাজে নিজেকে অপাংক্তেয় মনে করবেন না। কাজটি যদি সমাজ কল্যাণ হয় তবে সমাজও উপকৃত হবে। নিরক্ষরকে সাক্ষর করা ও তাকে শিক্ষিত করে তোলা এমনই একটি কাজ। সে কথা মনে করেই এই প্রস্তাব। এর ফলে শুধু সমাজই নয়, সমাজসেবকও উপকৃত হবেন।

সরকারি সাহায্যের কি প্রয়োজন নেই? : সরকারি সাহায্য ছাড়াই প্রস্তাবটি রূপায়ণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। কারণ— প্রথমত রাজ্য সরকারের নিজস্ব সাক্ষরতা অভিযান ও দ্বিতীয়ত ভারত সরকারের সর্বশিক্ষা অভিযান বর্তমানে চালু আছে। এদের

পরিপূরক হিসেবে ধরা যেতে পারে আমাদের এই প্রস্তাবটিকে।

পরিপূরক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা কী? : সরকারের অর্থ আছে, পরিকাঠামো আছে। কিন্তু নানা নিয়মের নিগড়ে বাঁধা। নিয়ম হৃদয়ের তাগিদে চলে না। যাদের জন্য এই ব্যবস্থা তাদের প্রত্যেকের অসুবিধা এড়িয়ে নিয়ম তৈরি করা অসম্ভব। কেবল যারা সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে তারা সরকারি সাহায্যের সুবিধা গ্রহণ করতে পারে। বাস্তবে অনেক দরিদ্র পরিবারই নানা কারণে সে সুযোগ নিতে পারে না। যাদের উপর সরকারি পরিকল্পনা রূপায়ণের ভার, তাদের প্রতিটি পরিবারের কাছে পৃথক ভাবে পৌঁছনোর দায়বদ্ধতা নেই, আর সেটা সম্ভবও নয়। তাই সমাজকে ছোট ছোট অঞ্চলে ভাগ করে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী ও সহানুভূতি নিয়ে যত বেশি সংখ্যক পরিবারের কাছে পৌঁছনো যায় তার জন্যই এই প্রচেষ্টা।

এই পরিকল্পনার সাফল্য আশা করা যায় কি?: এই প্রশ্ন অবশ্যই করা যেতে পারে। তাই শুরুতেই এটা প্রস্তাব না স্বপ্ন এই সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। তবে সদিচ্ছা, সহানুভূতি ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে এলে সফলতা অধরা নাও থাকতে পারে।

কর্মপদ্ধতি কেমন হবে?: প্রথমে রূপকার নাগরিকদের দুটো দলে ভাগ করে নিলে কাজের সুবিধা হবে বলে মনে হয়। ধরা যাক একজন বা প্রয়োজনে দুজন সংগঠক ও অন্যরা শিক্ষকের ভূমিকা পালন করবেন। কারণ যাঁরা শিক্ষকের দায়িত্বে থাকবেন তাঁরা সংগঠনের দিকে মনোনিবেশ করার সময় হয়ত দিতে পারবেন না। তাছাড়া বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য বিশেষ ধরনের গুণাবলী প্রয়োজন। একজন শিক্ষক সংগঠনের কাজে আগ্রহী নাও হতে পারেন। তেমনি সংগঠক শিক্ষকের ভূমিকায় স্বচ্ছন্দ নাও হতে পারেন।

সংগঠকের দায়িত্ব কী হবে?: পরিকাঠামোর ব্যবস্থা করা সংগঠকের এক গুরুদায়িত্ব। যাদের জন্য এই পরিকল্পনা, তাদের অনেকেই সারাদিন ব্যস্ত থাকেন রুজি রোজগারের ধান্দায়। সন্ধ্যার পর তাদের কোনো একটি সুবিধাজনক স্থানে একত্র করতে হবে। ব্যবস্থা করতে হবে আলোর। যদি সেটা স্কুলবাড়ি বা কোনো সদাশয় ব্যক্তির আশ্রয় হয়, তবে তাদের সহযোগিতা ও অনুমতি প্রার্থনা করতে হবে। এই কাজটি মনে হয় সবচেয়ে কঠিন। তাই প্রয়োজন এমন একজন সংগঠক যিনি জনসংযোগে দক্ষ ও আত্মবিশ্বাসী।

সংগঠকের দ্বিতীয় কাজটিও খুব সহজ নয়। সেটি হল– যাদের সাক্ষর করার উদ্দেশ্যে এই পরিকল্পনা, তাদের এই শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহী করা ও একত্রিত করা। দ্বিতীয় কাজটির ভার দ্বিতীয় সংগঠকের উপরে দেওয়া যেতে পারে। সরাসরি এই কাজে অগ্রসর হলে সফল হওয়া সম্ভবত কঠিন হবে। তাই একটু ঘুরপথে অগ্রসর হওয়ার পরিকল্পনা করলে বোধহয় ভাল হবে।

কেমন হবে সেই পরিকল্পনা?: সংগঠক পরিস্থিতি ও পরিবেশ অনুযায়ী নিজস্ব একটি পরিকল্পনা করতে পারেন। এখানে একটি নমুনা প্রস্তাব রাখা হল। সরাসরি লেখাপড়ার কথা বলে হয়ত শিশু বা কিশোরদের আকৃষ্ট করা যাবে না। বরং ধীরে চলো নীতি গ্রহণ করলে সফল হওয়া যেতেও পারে। যেমন কোনো খেলাধুলার ব্যবস্থা করা বা সরকারের প্রচার বিভাগের সাহায্য নিয়ে কোনো ছায়াছবি দেখান— এই রকম আনন্দদায়ক কিছুর মাধ্যমে একত্র করা। তারপর কোনো একটি অছিলায়, ধরা যাক যারা অনুষ্ঠানটিতে অংশগ্রহণ করল তাদের নাম সংগ্রহ করার ভান করে নাম-ঠিকানা লিখতে বলা হল। যারা লিখতে পারল না অর্থাৎ যাদের অক্ষরজ্ঞান নেই, সংগঠনের পক্ষ থেকে তাদের নাম-ঠিকানা লিখে নেওয়া হল। বলা বাহুল্য যে এখানে শিক্ষকদের ভূমিকাই হবে প্রধান। যা হোক, এভাবে অংশগ্রহণকারীদের নামের দুটি তালিকা তৈরি হল। যারা নিজে নাম লিখতে পারে নি তাদের সাক্ষর করার প্রস্তাব দিলে তারা এবার নিজেরাই আগ্রহী হবে বলে আশা রাখি।

যারা নাম নিজে লিখতে পেরেছে, অর্থাৎ যাদের অক্ষরজ্ঞান আছে কিন্তু আর পড়াশোনার সুযোগ পায় নি তাদের জন্য কিছু শিশুপাঠ্য বই বিতরণ করা যেতে পারে। কিন্তু অর্থের সংস্থান নেই। কাজেই জোগাড় করতে হবে কিছু পুরনো বই বা শিশুপাঠ্য সাময়িক পত্রিকা। যারা আরও একটু পরিণত তাদের দেওয়া যেতে পারে পুরনো সংবাদপত্র। পড়ার অভ্যাস বজায় রাখার জন্য ও শিক্ষার্থীর চাহিদা মতো পাঠ্য বিষয় নির্বাচন করে দেবেন তার শিক্ষক। ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে অন্তরঙ্গতা গড়ে তুলতে শিক্ষক হয়ত হবেন কোনো ছাত্রের 'দাদু' বা কোনো ছাত্রের 'কাকু' অথবা 'মেসোমশায়'।

শিক্ষণীয় বিষয় কী হবে?: আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য নিরক্ষরকে সাক্ষর করা ও ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োজনীয় জ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষার্থীকে অবহিত রাখা। প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক জ্ঞানের মধ্যে ধরা যেতে পারে (১) স্বাস্থ্যরক্ষার প্রাত্যহিক অভ্যাসগুলি— শারীরিক পরিচ্ছন্নতা, দাঁত ও চোখের যত্ন নেওয়া; (২) শৌচাগার ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা, শৌচের পর সাবানের ব্যবহার ইত্যাদি; (৩) ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, বসন্ত, পোলিও ইত্যাদির সংক্রমণ রোধের উপায় বুঝিয়ে দেওয়া ও প্রয়োজনে সরকারি সাহায্যগুলির সুযোগ নেওয়া; (৪) ও আর এস-এর ব্যবহার ও তার বিকল্প হিসেবে নুন-চিনি মেশানো সরবতের ব্যবহার; (৫) পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা; (৬) সব চাইতে আগে প্রয়োজন পাটিগণিতের প্রাথমিক চারটি নিয়ম —যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগের ব্যবহার শেখা।

প্রথাগত শিক্ষা নয়, সুস্থ জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাদানই আমাদের লক্ষ্য হোক। সেই উদ্দেশ্য মাথায় রেখে

শিক্ষক বিষয়গুলির ভিন্ন একটি তালিকা গ্রহণ করতে পারেন। উপরের তালিকাটি উদাহরণ মাত্র।

সাক্ষরতা এগিয়ে নেওয়ার পদ্ধতি কেমন হবে?: অক্ষরজ্ঞান অর্জনের উপায় সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষকদের নিজেদেরই যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। তবে দরিদ্র শিশুদের যথাসম্ভব অল্প সময়ে সাক্ষর করে তোলার বিশেষ কোনো উপায় হয়ত সাহায্য করতে পারে। নিরক্ষরকে সাক্ষর করার প্রচেষ্টা আজ নয় বহু বছর ধরেই চলে আসছে। সরকারি ও বেসরকারি অনেক সংস্থাই এই কাজে নিযুক্ত। তাদের অভিজ্ঞতা আমাদের শিক্ষকদের কাজে লাগতেও পারে।

প্রচলিত পদ্ধতিতে প্রথমে বর্ণপরিচয় ও তার পরে অক্ষরগুলি লেখার অভ্যাস করানো হত। তার বদলে যদি অক্ষর লেখার মধ্য দিয়ে অক্ষর পরিচয় করানো যায় তবে কেমন হতে পারে শিক্ষক মহাশয় সেটা ভেবে দেখতে পারেন।

কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক। সব অক্ষরের মধ্যে মনে হয় 'ত' অক্ষরটি সরলতম। এটি লেখা অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই উচ্চারণটিও অভ্যাস করাতে হবে সেটা বলাই বাহুল্য। যদি দেখা যায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে কারও নামের আদ্যক্ষর 'ত', ধরা যাক 'তরুণ', সেটা উল্লেখ করে বলা যেতে পারে এই ছেলেটির নাম লেখার জন্য প্রয়োজনীয় আদ্যক্ষরটি তাদের শেখা হয়ে গেল। এবার 'ত' অক্ষরটিকে একটু পরিবর্তন করে শেখা হল 'অ'। এটি 'অমল' নামের আদ্যক্ষর। উদ্দেশ্য শিক্ষার্থী যে তার নাম স্বাক্ষর করার লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে সেটা তুলে ধরা। শেখার আগ্রহ সৃষ্টি করা। পরবর্তী অক্ষর 'আ'। 'অ'-কে সামান্য পরিবর্তন করলেই এটি পাওয়া যাবে।

এইভাবে 'ব' থেকে পরিবর্তন করে পেতে পারি — ব,র,ক, ধ,ঝ,থ,খ এবং ঋ। 'ব' থেকে আরও পেতে পারি 'য,য়,ফ'। 'ড' থেকে পাই — ড,উ,ঊ,ভ,ঙ। আধা 'ত' থেকে — ই,ঈ,হ,ও,ঔ। একবার উৎসাহ সৃষ্টি করতে পারলে অন্যান্য বিশেষ অক্ষরগুলি শেখানো যেতে পারে। শুরুতে 'ত'-এর বদলে 'ব'-কেও বেছে নেওয়া যেতে পারে— যদি সেটা শেখাই সহজ মনে হয়। তবে প্রত্যেক অক্ষরের সঙ্গে কোনো শিক্ষার্থীর নাম বা কোনও পরিচিত ফুল, ফল বা প্রাণীর নামের সঙ্গে যুক্ত করতে পারলে শিক্ষার্থীর মনে এই ধারণাটা দৃঢ় হবে যে তারা মুখের ভাষাকে লিখিত রূপ দিতে চলেছে।

দ্বিতীয় ধাপে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণগুলিকে প্রচলিত বিন্যাসে রেখে মুখস্থ করানো যেতে পারে (অ,আ,ই,ঈ ... ক,খ,গ,ঘ ... ইত্যাদি)। দেখানো যেতে পারে স্বরবর্ণযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের রূপ। এ কাজে বর্ণপরিচয় (প্রথম ভাগ) মনে হয় আদর্শ পুস্তক। পাওয়া যায় স্বল্প মূল্যে। বইটিতে প্রথমে স্বরবর্ণ বর্জিত শব্দ ও পরে স্বরবর্ণযুক্ত শব্দের সঙ্গে পরিচয় করান হয়েছে। রয়েছে কিছু গল্প, কিছু ছড়া। দ্বিতীয় ভাগে আছে যুক্তাক্ষরের প্রয়োগ।

শতাব্দীকাল ধরে প্রত্যেক বাঙালির জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে এই বইটি। কাজেই এখানে শিক্ষক মহাশয়দের সঙ্গে এই বইয়ের পরিচয় করানোটা উদ্দেশ্য নয়। বর্তমান প্রস্তাবে শিক্ষাপদ্ধতির ক্রম তুলে ধরাটাই উদ্দেশ্য। পরিশেষে আর একবার মনে করিয়ে দেওয়া যাক যে শিক্ষকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির অবলম্বিত পদ্ধতিগুলি থেকে কোনো একটাকে উপযুক্ত মনে হলে সেটাকে বেছে নেওয়া যেতে পারে। সেই সঙ্গে এখানে প্রস্তাবিত পদ্ধতিটিও বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে। বলা বাহুল্য যে, নিরক্ষর ও সাক্ষরদের শিক্ষণীয় বিষয় যেহেতু আলাদা তাই এদের দুটি পৃথক বিভাগে বিভক্ত করে কাজে নামতে হবে।

পাটীগণিত প্রসঙ্গে এটা উল্লেখ করা যেতে পারে স্কুলপাঠ্য বইতে প্রাথমিক স্তরের জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য দেওয়া প্রশ্নগুলিও আমাদের এক্তিয়ারের বাইরে রাখাই ভাল। শুধুমাত্র দোকান-বাজারের কাজ ও ব্যাঙ্ক-পোস্ট অফিসের পাসবইয়ে দেওয়া হিসেব বোঝার মতো জ্ঞান অর্জন করাতে পারলেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক বলে ধরা যেতে পারে। সংখ্যার অঙ্কগুলি লেখার জন্য ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯,০-র সঙ্গে সঙ্গে 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 লিখন পদ্ধতিও শেখা দরকার। কারণ পাসবইতে দ্বিতীয় হরফই ব্যবহার করা হয়।

উপসংহার : বলাবাহুল্য প্রস্তাবটি রূপায়ণে সংগঠকদের কাজটি যথেষ্ট কঠিন। সফলতা যেমন উৎসাহকে বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে, তেমনি ব্যর্থতা সৃষ্টি করে হতাশা ও নিরুৎসাহ। এমন একটি পরিস্থিতিতে আমাদের উদ্যম কি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হবে? প্রচেষ্টাটি পরিত্যাগ করার আগে স্মরণ করা যাক আমাদের সংকল্প— নিরক্ষরদের সাক্ষর করে তোলা ও সাক্ষরদের কিছুটা শিক্ষিত করে তোলা। যখন জানতে পারি ভারতেরই বেশ কিছু রাষ্ট্র সাক্ষরতার হারে পশ্চিমবঙ্গকে ছাড়িয়ে গেছে তখন মনে হবে না কি যত দুরূহই হোক, পরাজয় স্বীকার করা চলবে না। বিশেষ করে যখন মনে পড়ে যায় অতীতে এই বাংলাতেই ছিল শিক্ষিতের সর্বাধিক সংখ্যা।

আমাদের কাজের পরিধি অবশ্যই সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য। এতে সাক্ষরতা বৃদ্ধির হার হবে অতি নগণ্য। এই ধরনের আর ছোট ছোট গোষ্ঠী যদি গড়ে ওঠে, তবে বৃদ্ধির হারে লক্ষণীয় পরিবর্তন আশা করা যেতে পারে। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারলে একটি গোষ্ঠীর সাফল্য অন্যকেও উৎসাহিত করতে পারে। অভিজ্ঞতার বিনিময় করা যেতে পারে। কালে এমন একজন সংগঠককে আমরা পেতেও পারি যিনি এই আন্দোলনকে সারা বাংলায় ছড়িয়ে দিতে এগিয়ে আসবেন। অতীতে ভারতকে নেতৃত্ব দিয়েছে বাংলা। বর্তমানের এই দুঃসময়েই বা বাংলা কেন নিশ্চেষ্ট থাকবে?

পরিশেষে একটি কথা মনে করিয়ে দেওয়া যাক। আমাদের নির্বাচিত কর্মীগোষ্ঠীর সদস্যরা জীবনের শ্রেষ্ঠ বছরগুলিতে নিযুক্ত ছিলেন সরকারি-বেসরকারি নানা ধরনের কর্মযজ্ঞে। তাঁদের অর্জিত অভিজ্ঞতা ও কর্মোপলক্ষে জনসংযোগ আমাদের সংগঠনের কাজে এক বহুমূল্য সম্পদ। দ্বিতীয়ত, এই কর্মীগোষ্ঠীর এখন আর কোনো পিছুটান নেই। পূর্ণ সময় ও মনোযোগকে এই কাজে প্রয়োগ করতে তাদের কোনো বাধা নেই। তৃতীয়ত, শুধুই পরোপকার নয়, সদর্থক সমাজ-উন্নয়নের কাজে নিযুক্ত হয়ে তিনি একাকিত্বকে দূরে সরিয়ে এক মানসিক তৃপ্তি অনুভব করতে পারবেন।

সবশেষে গৌরচন্দ্রিকাতে বলা প্রসঙ্গটি তুলেই বক্তব্যের ইতি টানা যাক। উপদেশ দেওয়া সহজ হলেও সেটা বাস্তবে রূপ দেওয়া অনেক অনেক কঠিন। তাই এই ইউটোপিয়া-সদৃশ প্রস্তাবটি হয়ত স্বপ্নই রয়ে যাবে। কেবল দৃঢ়চেতা, আত্মবিশ্বাসী ও সহানুভূতিশীল কর্মীরাই একে বাস্তব রূপ দিতে সমর্থ। এরাই আমাদের আশা-ভরসা।

উমা

পুস্তক পর্যালোচনা

রূঢ় বাস্তবের ‘জলছবি’

জলছবি ও অন্যান্য গল্প। শীলা চক্রবর্তী। মূল্য - ১৬০ টাকা। প্রাপ্তিস্থান: গাঙচিল, বুকমার্ক

২৭টি গল্প নিয়ে শীলা চক্রবর্তীর প্রথম ছোটগল্পের সঙ্কলন জলছবি ও অন্যান্য গল্প প্রকাশিত হল। এর আগে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর প্রথম উপন্যাস, ওপার বাংলা থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আসা মানুষদের জীবন নিয়ে লেখা ছিন্নমূল। শীলা চক্রবর্তী গণআন্দোলনের কর্মী। আন্দোলনের প্রয়োজনে মিশেছেন সমাজের নীচের তলার মানুষদের সঙ্গে, তাঁদের আত্মীয়তা অর্জন করেছেন; চারপাশের চলমান বস্তবতা তাঁর বোধ ও মননে যে ছাপ ফেলেছে, যে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় ছোটগল্পগুলি লিখেছেন, তাতে তাঁর মনে হতেই পারে গল্পগুলো মানুষের কাছে পৌঁছনো দরকার। বাংলা সাহিত্য আরো সমৃদ্ধ হবে কিনা সেটা আদৌ মাথা ঘামাবার প্রয়োজন বোধ করেন নি।

এখানে কয়েকটি গল্প নিয়ে আলোচনা করা হল। প্রথম গল্পটি ‘সমতট’, সিঙ্গুর আন্দোলনের পটভূমিকায় লেখা। জমির আন্দোলন নিয়ে শাসক ও বিরোধী দলের দড়ি টানাটানির মধ্যে জলধরের মতো গরিব কৃষকেরা আত্মহত্যা করে। বিরোধী রাজনৈতিক দলের পুঁজি হয় যে। তাদের বৌরা কোথায় হারিয়ে যায়। গল্পটিতে সংসদীয় দলগুলির প্রতি গল্পকারের একটা বক্রদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। ‘উদ্বেল’ গল্পে দেখি এক বানভাসি পরিবারের শহরতলির রেললাইনের ধারে ঝুপড়িতে আশ্রয় নিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টার মধ্যে অন্ধকার জগতের শ্বাপদরা যখন পরিবারটির ডাগর হয়ে ওঠা মায়ার দিকে হাত বাড়ায়, তখন এগিয়ে আসে সমীর, মায়াকে অন্ধকার পিচ্ছিল পথে হারিয়ে যাওয়া থেকে বাঁচায়। কিন্তু তারপর ...। সমীরকে আঁকড়ে মায়ার বেঁচে থাকার উদ্বেলতায় গল্প শেষ। সমীর-মায়াকে কেন্দ্র করে এক নতুন গল্পের সম্ভাবনা তৈরি হয়।

নোনাজলের বানভাসির দেশের গরিব মানুষগুলিকে নিয়ে নেতাদের নোংরা রাজনীতির পরিণতি একের পর এক গরিব মানুষগুলির খুন হয়ে যাওয়া, লাশে পরিণত হওয়া। সেই লাশ মর্গে পৌঁছে দেওয়া পেশা হয়ে দাঁড়ায় কারো কারো। একদিন হয়তো সে নিজেই লাশ হয়ে যাবে! ‘লাশ’ এক নিষ্ঠুর বাস্তবতার গল্প। ‘নাটকীয়’ এক প্রতিবাদী মেয়ের গল্প, যে বিয়ের রাতেই হাতের শাঁখা ভেঙে ফেলে, সিঁথির সিঁদুর মুছে দেয়, যখন সে জানতে পারে এতদিন ধরে ভালবাসার অভিনয় করে আসা মানুষটার আসল পরিচয়। এই নাটকীয় ঘটনা যদি বাস্তবে সত্য হত! বস্তি-ঝুপড়িবাসীদের অভাবী ছেলের সমাজবিরোধীতে পরিণত হওয়ার চেনা ছকের বাইরে একটা ভিন্নস্রোতের গল্প হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি করেও অসম্পূর্ণ রেখে দিলেন গল্পকার ‘ভিন্নস্রোত’ গল্পে। লতুর ভালবাসার ছোঁয়ায় ভাদুর নতুন জীবনের কল্পনার ভারটা পাঠকদের ওপরই ছেড়ে দিলেন গল্পকার। অভাবের তাড়নায় সোনালী চতুর্ভুজের রাস্তা তৈরির কাজে গ্রাম থেকে অনেকের সঙ্গে গদাই কাকার হাত ধরে শহরে এসে অবাক বিস্ময়ে চারপাশে তাকাতে গিয়ে ঠিকেদারের গালাগাল খায় আজকের অপু — ফ্যালা। সারাদিনের খাটুনির পর কাদার মতো ঘুমিয়ে পড়ে ফ্যালা পরের দিন মাড়াই কলে আখের মতো ছিবড়ে হবে বলে। কাজ শেষ হয়ে গেলে ঠিকাদার কাজ থেকে বসিয়ে দেয়। গ্রামে গিয়ে কী খাবে, এই চিন্তায় যখন গদাই পাগলপারা, ঠিক তখনই নতুন তৈরি হওয়া ব্রিজটা ভেঙে পড়ায় গদাই আনন্দে নাচতে থাকে, আরও কিছুদিন কাজ পাবার আশায়। বেচারা ছোট্ট ফেলা গ্রামে গিয়ে মাকে দেখতে পাবার আনন্দে মশগুল এই খবরে কেঁদে ফেলে। নরম শৈশবের সঙ্গে কঠোর বাস্তবতার বৈপরীত্য, গদাইয়ের বাস্তবতার সঙ্গে ছোট্ট ফ্যালার বাস্তবতার

এরপর ২৭ পাতায়

মেয়েরা ভাল নেই, ছেলেরা আছে তো?

অজানা চৌধুরি

বয়স আর অসুস্থতার সাঁড়াশি অভিযানে বেহাল। তা সত্ত্বেও ''অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক'' বক্তৃতার বিষয়টি 'এ উপমহাদেশে মেয়েরা কেমন আছে' —আমাকে টেনে দাঁড় করালো কিছু এলোমেলো কথা বলার জন্যে। মেয়ে হিসেবে যে দীর্ঘপথ আমাকে চলতে হয়েছে, সেখানে হাটে-বাজারে, সমাজে-কর্মক্ষেত্রে এতকাল বহু ধাক্কাধাক্কি সহ্য করতে হয়েছে। শুধু মেয়ে বলেই। প্রতিবাদ করতে হয়েছে অনবরত। প্রতিরোধ করে পা ফেলতে হয়েছে ক্রমাগত। তাই কথাগুলো এলোমেলো হলেও সেইসব তিক্ত অভিজ্ঞতা-জারিত। পরিসংখ্যান-গত বিশ্লেষণ না হলেও বাস্তব-ছোঁয়া মোটা দাগের স্কেচ্।

'এ উপমহাদেশে মেয়েরা কেমন আছে' —এ কথার উত্তর দিতে গেলে এই বিশাল পরিসরে যে সব বিচিত্র সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে—বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মেয়েদের কাছ থেকে, সে সব সমস্যাগুলোর সমাধান-সূত্র কয়েকটা সাংখ্যতথ্যে খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন। সে চেষ্টা আমি মোটেই করব না। আমি যা জানি সেটা এই যে, এদেশের স্তরবিন্যস্ত সমাজে বিভিন্ন স্তরের মেয়েদের সমস্যাগুলো বেশ আলাদা-আলাদা। নিম্নবিত্ত ও প্রান্তিক মেয়েদের (যাদের সঙ্গে আমার নৈকট্য বরাবরই বেশি) সমস্যাগুলো বহুকৌণিকতায় আচ্ছন্ন স্বভাবতই। দারিদ্র্যের সঙ্গে অসাম্য, অস্বাস্থ্য, অশিক্ষা এবং অন্ধ কুসংস্কার ছেয়ে রয়েছে তাদের জীবন-মন। উচ্চবিত্ত শিক্ষিত নাগরিক সমাজের মেয়েদের উন্নতি, কর্মধারা, চলাফেরার স্বাধীনতা দেখে শিক্ষায়-সুযোগে পিছিয়ে-পড়া মেয়েদের জীবনের জটিলতা কিছুতেই ঠিক বোঝা যাবে না। উচ্চবিত্ত মেয়েরা অর্থস্বাচ্ছন্দ্যে, শিক্ষার জোরে অনেক বাধা-বিপত্তি অনায়াসে কাটাতে পেরেছে, কিন্তু সমাজের নীচের তলার মেয়েরা ভাল আছে এ কথা কিছুতেই বলা যাবে না এখনও। সত্যি বলতে কি নীচের-তলার ছেলেরাই কি ভাল আছে? আমার এই উপমহাদেশ কি সামগ্রিক ও সার্বিক অর্থে প্রগতিশীল? এখানে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ এখনও এত অস্বচ্ছ, দুর্নীতি এত ব্যাপক, স্বজনপোষিত স্বার্থান্বেষী রাজনীতির জাল এত বিস্তৃত, তদুপরি দারিদ্র্য, বেকারসমস্যা, অশিক্ষার দুরপনেয় গোলকধাঁধা— সেখানে দেশকে আমি সর্বার্থে প্রগতিশীল বলি কি করে! এই ব্যাপক অবক্ষয় ক্রমপ্রসারিত হচ্ছে সমাজের সর্বত্র। শিক্ষায়, রাজনীতিতে, সংস্কৃতিতে এই আত্মসংহারক অবক্ষয় সমস্ত মানবিক বোধ, নৈতিকতার আদর্শ গুঁড়িয়ে দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চলেছে। সুশীল বিদ্বজ্জনেরা এই অন্ধকার সরাবার আপ্রাণ প্রচেষ্টা করেন কি? না, প্রচারমাধ্যম মারফত কিছু কিছু বাক্য বিনিময় করেই হাত উল্টে দেন? এই অবক্ষয়িত সমাজের আত্মশক্তিহীন, অসহিষ্ণু কিছু অপারগ পুরুষের অভিঘাত তাই বারবার এসে পড়ে অপেক্ষাকৃত দুর্বল, অসতর্ক মেয়েদের ওপর। শ্বাপদসুলভ কুটিলতায় এরা মেয়েদের নির্যাতন করে, বিধ্বস্ত করে। কারণ, এর চেয়ে বড় কাজ করবার শক্তি তো তাদের নেই। এর প্রতিকার অবশ্যই ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট, আইন, কঠোর শাস্তি। কিন্তু এর পরেও যেটা অনালোচিত থাকে সেটা মেয়েদের আত্মরক্ষার অধিকার। একটু স্পষ্ট করে বলি।

আমাদের বাড়ি ফিরতে রাত ৮টা হত। আজ থেকে ষাট বছর আগের কলকাতার রাস্তা, বিশেষ করে উত্তর কলকাতা, হয়ে যেত নির্জন। সাবধানতার জন্যে আমরা সঙ্গে রাখতাম ছোরা বা পাঞ্চ্। এ ধরনের কিছু আত্মরক্ষার সামগ্রী সঙ্গে রাখলে নির্ভয়ে পথ চলা যায়। অবশ্য সতর্ক থাকাটা সবসময় দরকার। আবার ছোরা বা পাঞ্চ্ চালাতেও জানা চাই। এখনকার মেয়েরা এর চেয়ে একটু উন্নততর ব্যবস্থাও তো নিতে পারে!

১৯৪৪ থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত আমরা কিছু ছাত্রছাত্রী একটা সংগঠন তৈরি করেছিলাম। সংগঠনটির কাজ ছিল কলকাতার প্রান্তবর্তী শ্রমিক ও ধাঙ্গড় বস্তিতে গিয়ে কিছু জনসেবামূলক কাজ। স্বভাবতই শ্রমিকদের সঙ্গে মোলাকাত করতে হলে সায়াহ্ন ছাড়া গতি ছিল না। আমাদের বাড়ি ফিরতে রাত ৮টা হত। আজ থেকে ষাট বছর আগের কলকাতার রাস্তা, বিশেষ করে উত্তর কলকাতা, হয়ে যেত নির্জন। সাবধানতার জন্যে আমরা সঙ্গে রাখতাম ছোরা বা পাঞ্চ্। এ ধরনের কিছু আত্মরক্ষার সামগ্রী সঙ্গে রাখলে নির্ভয়ে পথ চলা যায়। অবশ্য সতর্ক থাকাটা সবসময় দরকার। আবার ছোরা বা পাঞ্চ্ চালাতেও জানা চাই। এখনকার মেয়েরা এর চেয়ে একটু উন্নততর ব্যবস্থাও তো নিতে পারে! শক্তি ও সাহসের চর্চাটা করে দেখলে ক্ষতি কি! দাঙ্গার সময়ে কলকাতার

নানা বস্তি অঞ্চলে যখন আমরা দলবদ্ধ হয়ে গিয়েছি তখনও এইসব আত্মরক্ষার সামগ্রী আমরা সঙ্গে রাখতাম,— অবশ্য গোপনে। কারণ, সেগুলো ছিল Peace Mission।

যে কোনো মানুষের স্বাভাবিক আত্মপ্রকাশের জন্যে একটা আনন্দপূর্ণ কর্মময় জীবনের জন্য দরকার প্রযোজনীয় শিক্ষা, কাজ করবার ও বৃত্তি নির্বাচনের স্বাধীনতা, আর্থিক স্বাবলম্বন, স্বচ্ছন্দে চলাফেরার নিশ্চয়তা এবং কাজকর্মের যথাযোগ্য স্বীকৃতি—ঘরে এবং কর্মক্ষেত্রে। এখনও এসব সুবিধা-সুযোগ পাওয়ার জন্য মেয়েদের যথেষ্ট লড়াই চালাতে হয়। চলতি জনমতের বিরুদ্ধে যেতে হয়, ঘরে এবং বাইরে। বিশ-ত্রিশ বছরের আগের এই ছবিটা যদি কিছুটা পাল্টে থাকে এখন — তবে ভাল।

কর্মক্ষেত্রে এবং বাড়িতে আমি বহু আপাত-সুভদ্রজনকে নিতান্ত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে অবজ্ঞাসূচক বচন নিক্ষেপ করতে দেখেছি মেয়েদের প্রতি—নিজের স্ত্রীকে, সহকর্মী মহিলাকে বা অধস্তন মহিলা কর্মচারিকে, অতি অনায়াসে। সময়োচিত প্রতিবাদের স্পর্ধা যেন মেয়েদের থাকে। অর্থহীন জনমত তা যতই সংখ্যাগরিষ্ঠের হোক না কেন, যতই গরিমাময় ঐতিহ্যবাহী শোনাক না কেন, নিজের ধ্যান-ধারণা, জীবন ও কাজের অন্তরায় হলে ট্র্যাডিশন উপেক্ষা করাই উচিত। একটা ছোট উদাহরণ দিই। এদেশের ট্র্যাডিশন বিবাহোত্তরকালে মেয়েদের সম্পূর্ণ আনুগত্য থাকবে শ্বশুরবাড়ির জন্য নির্দিষ্ট। প্রয়োজন থাকলেও, মেয়েটি উপার্জনকারী হলেও তার বাবা-মা-র বৃদ্ধবয়সের কোনো দায়িত্বই মেয়েটি প্রায়শই নিতে পারে না। এই ধরনের রীতিনীতি নির্দ্বিধায় অগ্রাহ্য করাই সঙ্গত। নিজেকে 'মেয়েমানুষ' বলে না ভেবে 'মানুষ' হিসেবে ভাবলে জীবনের যথাকর্তব্যগুলো মুক্ত বুদ্ধি নিয়ে ঠিক করে ফেলা যায়। একজন মানুষ যেমন আর্থিক স্বাবলম্বনের ওপর উঠে দাঁড়ায়, প্রতিটি মেয়ের সেই চেষ্টাটা করা ভাল। এই চেষ্টাটা আত্মবিশ্বাস আর আত্মমর্যাদাবোধ এনে দেবে। আত্মমর্যাদা অর্জন করতে হয়, ভিক্ষেয় আসে না। বিবাহে পণ দেওয়া বা নেওয়া সম্পূর্ণ আত্মমর্যাদাহানিকর উভয়পক্ষেরই। 'ঘুষ' দিয়ে কোনো সৎ-সম্পর্ক গড়ে তোলা যায় কি? সম্পর্কটা তৈরি হবে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালবাসাকে ভিত্তি করে, পণ বা 'ঘুষ'-এ নয়। এখানে একটা মজার বিয়ের ছড়া না শুনিয়ে পারছি না। জীবন থেকে উঠে আসা ছড়া। 'উলু-উলু মান্দার ফুল ঝাঁকে ওড়ে টিয়া/আর সেই ফুল কুড়াইতে গিয়া দ্যাখ্‌তে পাইলাম বিয়া/জামাই রইলো ঢেঁকি ঘরে কুত্তায় খাইলো কান/আরে, ওঠো ওঠো সোনার জামাই কন্যা দিব দান।' লাল মান্দার ফুল, সবুজ টিয়ার ঝাঁক আর নীল আকাশের প্রেক্ষাপট—এই বাসন্তী দৃশ্যটি যতখানি দৃষ্টিনন্দন, ততটাই কি নান্দনিকতায় ভরা ভবঘুরে কান-কাটা জামাইয়ের সঙ্গে এক মানহারা মানবীর এই গাঁটছড়া বাঁধা? ছড়াটির নিহিতার্থ বোধ হয় এই যে গলগ্রহ মেয়েটিকে 'বিবাহ' নামক এক প্রহসনের মধ্যে দিয়ে গলাধাক্কা দিয়ে বিদায় করো। তারপর হাতটাত ধুয়ে ফেলো। এই ধরনের বহু মানহারা মানবীকে আমি দেখেছি এদেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজে। তারা পরাশ্রিত হয়ে, মাথা নিচু করে দিন কাটায়। যথেষ্ট পরিশ্রম করেও কোনো সম্মান বা কোনো অধিকার অর্জন করতে পারে না, চিরকাল অনুগৃহীত হয়ে থেকে যায়। লোকে দুঃখ করে বলে 'কপাল'। কোনো প্রতিবিধানের চেষ্টা কেউ করে না! এভাবে বহুবিধ শাস্ত্রীয় অনুশাসন, জাতপাতের বিচার, টাকাপয়সার দেওয়া-নেওয়া মেয়েদের মানতে বাধ্য করা হচ্ছে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত। সমস্বরে প্রতিবাদের আওয়াজ তোলা হয় না কেন? 'পুড়বে মেয়ে উড়বে ছাই, তবেই মেয়ের গুণ গাই' —এই ঊনবিংশ শতকের প্রবাদ কিন্তু একুশ শতকেও বরবাদ হয়ে যায় নি। রাজস্থানে, উত্তরপ্রদেশে খাপ-পঞ্চায়েতের সদর্প আস্ফালনে এখনো এটা চলছে নতুনভাবে। কন্যাভ্রূণ হত্যা, শিশুকন্যাকে গলা টিপে মারা চলছে দিব্যি সারা ভারতে। কন্যার জন্মকে অভিশাপ বলে মনে করছে স্বয়ং বাপেরাই। কতখানি নিরেট মূঢ়তা জমাট বেঁধে আছে এই উপমহাদেশে ভাবা যায় ? পৃথিবীর বৃহৎ গণতন্ত্রের দেশ!

যাক্‌গে, বাজে বকা থামাই একটা ছোট্ট ঘটনা বলে। সত্যি বলছি, বেশি সময় নেবো না। শোনো, সমাজে মেয়েরা এককভাবে ভালো থাকতে পারে না। পরিপূরক অংশটিকেও তবে ভালো থাকতে হয়, ভালো হতে হয়। যাদের সঙ্গে ঘরে-বাইরে আছি, ওঠা-বসা করছি, স্কুলে-কলেজে-অফিসে-মাঠে কাজকর্ম করছি তারা যদি সমমনস্ক সহযাত্রী না হয় তবে মেয়েরা ভাল থাকে কী করে? এই বিষয়ে যে ঘটনাটা বলব সেটা এই — ১৯৪৫ সাল, ধর্মতলার মোড়ে আমরা বহু ছাত্রছাত্রী বসে আছি। দিল্লির লালকেল্লায় ব্রিটিশরাজের আদালতে চলেছে 'আজাদ হিন্দ' ফৌজের সেনানীদের বিচার। সমস্ত কলকাতার ছাত্রেরা প্রতিবাদে মুখর। কাল এখানে গুলি চলেছে--- দুজন মৃত, আহত অনেক। সামনে একসার গোরা-ঘোড়সওয়ারের ব্যারিকেড নিয়ে আমরা সকলে এখানেই দুটো রাত কাটিয়েছি। কখনো মুষ্টিবদ্ধ হাতে চেঁচাতে চেঁচাতে উঠে দাঁড়াচ্ছি, আবার বসে পড়ছি। এই চলছিল। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এসে আমাদের শান্ত থাকতে বলে গেছেন। আর কেউ আসেন নি। হঠাৎ তৃতীয় দিনে আমরা ঠিক করলাম—উঠে দাঁড়াব সকলে একসঙ্গে। একে অপরের হাত ধরে ছুটে চলব ব্যারিকেডের দিকে, যা থাকে কপালে, ব্যারিকেড ভাঙবোই। একসঙ্গে আমরা তীব্রবেগে ছুটে চললাম সেই ঘোড়সওয়ারি ব্যারিকেডের দিকে। 'চলো দিল্লী' শ্লোগানটা তখন পাল্টে গিয়ে হয়ে উঠেছে —'চলো, চলো ডালহৌসী চলো'—ওটা নিষিদ্ধ এলাকা। এই ছাত্র-জনতার বিপুল জোয়ার যখন বিবাদী বাগে

(তখন ডালহৌসী স্কোয়্যার) পৌঁছল তখন দুপাশের উঁচু বাড়িগুলো শুধু অজস্র কালো মাথায় ভর্তি আর অগুনতি হাতের আন্দোলন। রাস্তার জন-কল্লোলে সমুদ্রের গর্জন। এই জনজোয়ারের স্মৃতি এখনও আমায় ভুলিয়ে দেয়, আমার ৮০ অতিক্রান্ত বয়সটাকে। দীর্ঘ ৬৮ বছর পরে সেই সাহসী জন-উন্মাদনা আবার আমি দেখলাম দিল্লিতে বিগত ডিসেম্বরে। এরা সকলে 'দামিনী'র জন্য শীতের রাতে জলে ভিজলো —তবু নড়ল না, মার খেল তবু পেছোল না। আশা জাগলো এইবার। সংসদে সদস্যসংখ্যা বাড়ার চাইতেও বেশি ক্ষমতায়ন যেন এল হাতের মুঠোয়। মেয়েদের প্রতি অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ যদি এইভাবে করতে পারি তবে আটকাবে কে? ভেবেছিলাম বিদ্বান রুচিবান ফার্স্ট সিটিজেন তাঁর প্রোটোকলের আগল ভেঙে হয়ত এসে দাঁড়াবেন এই জনতার সামনে। সে গুড়ে বালি। রুচি, শিক্ষা থাকলেই বা কি, সাহস থাকা চাই। 'অমন তো কতই হয়' এই তাচ্ছিল্যবাক্যটি উচ্চারিত হয়েছিল তো এক উচ্চশিক্ষিত, সাম্যবাদী, রাজ্যপ্রধানের মুখে, বানতলায় অনিতা দেওয়ানের অকালমৃত্যুর পরে। মণিপুরের মায়েদের নগ্ন প্রতিবাদে স্তম্ভিত হয়েছে সারা বিশ্ব, কিন্তু এদেশের প্রশাসকেরা? বারো বছর ধরে শর্মিলার অনশন অগ্রাহ্য করা হয় এখানে। এ এক আশ্চর্য দেশ! ধর্মগুরুরা এখানে স্বধর্মের ঠাঁট-বাট রেখেই বলতে পারেন নির্লজ্জভাবে —'ভাই' বলে ডাকলেই তো অত্যাচারীরা আর মেয়েটিকে বিধ্বস্ত করতে পারত না। কেউ এদের উচ্চাসন থেকে কেন টেনে নামায় না, কঠোর সমালোচনাও করে না, কেন? আমার প্রশ্ন তাই এই উপমহাদেশের ছেলেরা সুস্থ মস্তিষ্ক নিয়ে ভাল আছে তো? বিবেকহীনতায় ভুগছে না তো? নৈতিকতার মহতী বিনষ্টি কি ঘটে নি তাদের মধ্যে? সেই হারানো নৈতিকতাকে ফিরিয়ে আনতে কি চেষ্টা করছে বিদ্বৎসমাজ? শুধু কি সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা করে আলগোছে আর যার -যার পার্টির ধ্বজা ধরে?

সমাজে আমাদের প্রতিটি মানুষের জীবন আলাদা, প্রেরণা আদর্শ আলাদা, কিন্তু তবু আমরা একে অপরের সঙ্গে কিছু বাঁধনে বাঁধা। এই ঐক্যবন্ধনটাই সমাজটাকে চালায়। তাই বলি সমাজের অপর অংশ ছেলেরাও ভালো নেই— মেয়েদেরই মতো। বড় অসুস্থতায় ভুগছে হৃদয়বৃত্তির অভাবে, যে হৃদয়বৃত্তি বিবেকবুদ্ধি জাগায় তা আজ নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে আত্মপরায়ণাতার ধান্ধায়। প্রতিবাদ-প্রতিরোধ নেই, একে অপরের হাত ধরা নেই। মেয়েদের ভালো থাকতে গেলে পরিপূরক অংশ ছেলেদেরও যে ভালো থাকতে হয় —সে কথা ভুলে গেল সবাই?

ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে নতুন যুবসমাজকে বলি, বন্ধুতার হাত বাড়াও একে অপরের দিকে। সম্মিলিত শক্তিতে ভাঙো সব প্রতিবন্ধকতার বেড়াগুলো। দূর কর পতিতাবৃত্তি, একে অপরকে দাবিয়ে রাখার প্রবৃত্তি। মেয়েদের সংকীর্ণ পায়ে-চলা পথটি এসে মিশুক প্রশস্ত জনপথে। মেয়েদের বদ্ধ নিত্যজীবনে লাগুক বিশ্বজীবনের ছোঁয়া। এই হৃদয়বৃত্তি ও বিবেকের চর্চা শুরু করেছিলেন রামমোহন বিদ্যাসাগর— সে কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয় নি।

উমা

রূঢ় বাস্তবের 'জলছবি'

২৪ পাতার পর

বৈপরীত্য 'বিপ্রতীপ' গল্পের মূল বিষয়। দৃঢ় বাস্তবতার ছবি ফুটিয়ে তোলার ভাষাটাও যে গল্পকারের আয়ত্ত, গল্পটি পড়লে তা বোঝা যায়। 'বিদেশী' গল্পে গল্পকারের দাদা তাঁর শৈশবকে খুঁজতে গিয়েছিলেন ওপার বাংলার বরিশালে। এবং খুব স্বভাবিকভাবেই তা পাননি। আমরা কেউই তা পাই নি। আসলে চেনা জায়গাগুলোর পাল্টে যাওয়ার শুধু নয়, শৈশবের চোখটাও আর থাকে না। আমরা তো কেবল পুরনো জায়গাগুলি খুঁজতে যাই না, আমরা সন্ধান করি শৈশবের, যা কোনো দিনই আর খুঁজে পাওয়া যায় না। 'কমেডি' উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের গল্প। উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের মা-বাবারা ছেলেমেয়েদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত সফল মানুষ করে তোলে। বিনিময়ে হয় বৃদ্ধাশ্রমে বা একা ঘরের মধ্যে মরে পড়ে থাকে। ভাদুড়ি বাড়ির ন-বৌ ছায়ারও সেইরকম এক মৃত্যুর কথা ছিল, কিন্তু ঘটনাক্রমে সে বেঁচে যায়। দিল্লি থেকে ছুটে আসা অংশুর ক্রোধোদ্দীপ্ত মস্তিষ্কে ব্যাপারটা কমেডি ড্রামা বলে মনে হয়। 'আরোহণ' গল্পের জুটমিলের শ্রমিক কানাই জুটমিলের আন্দোলনের নানান চোরাস্রোতে বিভ্রান্ত। সে বুঝতে পারে না কাদের দলে গিয়ে ভিড়বে। শেষ পর্যন্ত সঠিক রাস্তাটা সে চিনে নেয়। গল্পটাতে কানোরিয়া আন্দোলনের ছাপ আছে। লেখা বাহুল্য, শীলা চক্রবর্তী কেবলমাত্র প্রফুল্ল চক্রবর্তীর স্ত্রীই নন, নিজেও একজন আন্দোলনের সংগঠক। 'জলছবি' গল্পটি অভাবী সংসারটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য গোলাপীর অক্লান্ত লড়াইয়ের গল্প। রোজখাটা মুনিশ জগদীশ গোলাপীকে নিয়ে পালিয়ে এসে ঘর বাঁধে, কারখানায় কাজ নেয়। তারপর একদিন কারখানার ঝামেলায় মাথায় রডের বাড়ি খেয়ে পঙ্গু হয়ে বাড়িতে শয্যাশায়ী। বাচ্চাগুলোর মুখে কিছু তুলে দেবার প্রয়োজনে রেজিনার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে গোলাপী। রেজিনারা কলকাতা থেকে সস্তায় জামাকাপড় কিনে গ্রামে গ্রামে ঘুরে গরিব মানুষদের কাছে বিক্রি করে। ডাগর হয়ে ওঠা বড় মেয়ের বিয়ের চিন্তায় তাঁর রাতে ঘুম হয় না। শেষ পর্যন্ত জগদীশের মৃত্যুতে গোলাপীর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। রূঢ় বাস্তবতার এক জলছবি যেন। — **অরুণ পাল**

উমা

অনামিকা, তুমি অপরাজিতা

পূরবী ঘোষ

বাংলার আপামর জনগণ যাঁরা সকালবেলা উঠেই খবরের কাগজের পাতায় চোখ রাখেন, তাঁরা গত ৯ জুন কাগজ খুলেই স্তম্ভিত হয়ে দেখলেন যে, বারাসতের প্রত্যন্ত এক গ্রাম 'কামদুনি'-র মানুষজন সমবেতভাবে গ্রামের মেয়ের ধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদের এগিয়ে এসেছেন। শুধু তাই নয়, দৈনিক খেটে খাওয়া রাজমিস্ত্রির জোগাড়ে পরিবারের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও ধর্ষিতা ও নিহত মেয়েটির দাদা ও ভাই 'মন্ত্রীমশাই'-এর চাকরি দেওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে নজির গড়েছেন, দেখিয়ে দিয়েছেন গণদাবি ঠেকানো যায় না। ঘটনা এই যে, স্নাতক স্তরের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী মেয়েটি— সংবাদপত্র যাকে 'অপরাজিতা' নামে অভিহিত করেছে, সুদূর কামদুনি থেকে রাজারহাটের ডিরোজিও কলেজে পড়তে আসত। গ্রামের মেয়েদের যেখানে মাধ্যমিকের পরই শ্বশুরবাড়ি যেতে হয়, সেখানে অপরাজিতা চেয়েছিল স্নাতকোত্তর স্তরে পড়াশোনা করতে। সম্ভবত এটাই তার অপরাধ। কারণ গ্রামের তথাকথিত 'দাদারা' যেখানে সান্ত্রীমশাইয়ের হুকুম তামিল করে আর তাদের তাবেদারি করে দিন গুজরান করে, সেখানে 'গাঁয়ের মেয়েছেল' কিনা তাদের টেক্কা দিয়ে কলেজে যাবে? এতটা ঔদ্ধত্য 'দাদাদের' সহ্য করা শক্ত হল। তাই একই সঙ্গে নিজেদের কামনা-লালসার পরিতৃপ্তিও ঘটানো হল আর ওকে খুন করে চরম শাস্তিও দেওয়া হল, যাতে আর কোনো মেয়ে যেন এই সাহস না দেখায়। কিন্তু কামদুনি গ্রামটি যেন প্রতিজ্ঞা করেছে যে নিজেদের সাহস ও মনোবল দেখিয়েই দেশের মধ্যে বিখ্যাত হবে। আর তাই প্রশাসনের মুখের ওপরেই তারা বলে দেয়, 'আমরা কি ভিখারি নাকি?' তারা বলতে পারে যে, 'আমাদের কথা না শুনে চলে যাচ্ছেন কেন?' যদিও একথা বলার জন্য তাদের ওপর নেমে এসেছে হুমকির ঝড়। তবুও তারা অপরাধীদের শাস্তির দাবিতে আজও অনড় হয়ে রয়েছে। কামদুনির মানুষের দৃঢ়তা ও অনমনীয়তার ঢেউ শেষ পর্যন্ত আছড়ে পড়েছে কলকাতার বুকে। কলকাতার মানুষজন গর্জে উঠেছে, অবিলম্বে অপরাধীদের শাস্তিও তাঁরা দাবি করেছে। কিন্তু মজাটা এই যে, তারপরেও প্রায় প্রতিদিন প্রত্যান্ত গ্রামাঞ্চল থেকে খবর আসছে ধর্ষণ, খুন ও শ্লীলতাহানির। এর প্রতিকার কী আমরা জানি না। কতটা সত্য-অসত্য তা জানি না। কারণ সংবাদমাধ্যম 'পাবলিক ভালো খাচ্ছে' বলে সত্য-মিথ্যে যাচাইয়ের আগেই ফলাও করে প্রচার করছে। ফাঁসি কোনো প্রতিকার নয়। ধনঞ্জয়ের ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সমস্যার সমাধান হয় নি।

প্রতিটি খবরই হাড়-হিম করা। বিশেষ করে শিশুদের ওপর যখন নেমে আসে ধর্ষণের অত্যাচার, তখন সেটা না যায় মেনে নেওয়া, না যায় কিছু করা। শুধু অক্ষম চিৎকার চোঁচামেচি করা ছাড়া আমাদের আর কিছুই করার থাকে না। এক্ষেত্রে কিছু পথ বোধ হয় আমাদের অপরাজিতার পরিবার ও পড়শীরাই দেখিয়েছে। আজ থেকে বছর চল্লিশেক আগে সত্তরের দশকে বহরমপুর হাসপাতালের বর্ণালী নামে একজন নার্স তাঁর রাতের ডিউটি শেষে হাসপাতালের বারান্দা দিয়েই নিজের ঘরে ফিরছিলেন। সেইখানে রাতের অন্ধকারে হাসপাতালেরই চতুর্থ শ্রেণির কর্মীদের দ্বারা ধর্ষিতা হন। এরপর লজ্জায় ও হতাশায় বর্ণালী আত্মহত্যা করেন। তখনকার কলকাতা আজকের মতো প্রতিবাদী ছিল না। বিদ্বজ্জন শব্দটি কাগজে তখনও চালু হয় নি। তবে দেশজুড়ে ছিঃ ছিঃ ধ্বনি উঠেছিল, সবাই নিন্দাও করেছিল। এই সয়ে 'গণবিষাণ' নামে একটি গণসঙ্গীতের দল 'বর্ণালী ফুল কেন ঝইর‍্যা যায়' গানটির মাধ্যমে তাঁদের প্রতিবাদ তুলে ধরতেন। না, তাতে সরকার বা ধর্ষক কারোরই বিশেষ টনক নড়ে নি। সময়ের পলিতে সে ঘটনা চাপাই পড়ে গেছে। আজ এত বছর বাদে কামদুনির অপরাজিতা আমাদের সেই বর্ণালীর কথাই মনে পড়িয়ে দিয়েছে। আজ বারে বারেই মনে হচ্ছে যে, আমরা শুধুই স্মৃতির চর্বিত চর্বণ করে যাব? প্রতিকারের পথ খুঁজবো না? হ্যাঁ, এর প্রতিকার করতে হবে ঘরে ঘরে প্রতিটি মাকে, প্রতিটি মাসিকে। ছোট থেকেই মেয়েকে শেখাতে হবে যে, মেয়ে হওয়া অপরাধ নয়। ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদেরও অধিকার প্রতিটি কাজে অংশ নেওয়ার। গড়ে দিতে হবে তাদের মনের শক্তি ও সাহস। তাদের তৈরি করে দিতে হবে, যে কোনো বিপদের মুখোমুখি হয়ে লড়ে যাওয়ার মতো মনের জোর ও উপস্থিত বুদ্ধি। তাদের শেখাতে হবে, ফ্যাশন প্যারেডের র‍্যাম্প কিংবা টিভির পর্দায় ডান্স বাংলা সাধারণ ঘরের মেয়েদের জন্য নয়। তার চেয়ে বড় কাজ শরীরে ও মনে শক্তি সংগ্রহ করা যা দিয়ে দুষ্কৃতির সামনে লড়া যায়। মনে রাখতে হবে বাংলার মেয়েরা একসময় বোমা-পিস্তল নিয়ে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে নেমেছিল। এমন নজির মিলেছে সত্তর দশকেও। তাই নারীকে অবলা ভাবাও ঠিক নয়। কামদুনির অপরাজিতা জীবন দিয়ে আমাদের তাই শিখিয়ে গেছে।

উমা

´ মূল্যবোধ নিয়ে বেশ কিছু পুরনো ছড়া-কবিতা একসময় ছাপা হয়েছিল পত্রিকায়। ছাপা হয়েছিল কিছু প্রবন্ধও। সেগুলোর একটা সঙ্কলনও প্রকাশ করতে চলেছি আমরা।

হারিয়ে যাচ্ছে ঐতিহ্যের ধান

নিজামুল হক

এদেশে আবাদ হতো ১৫ হাজার জাতের ধান। সুস্বাদু ও সুগন্ধি ঝারাবাদল, বাঁশফুল, বর্ণজিরা, তুলসীমালা, মধুমাধব, দুধজ্বর এখন আর দেখা যায় না।

"আমার বাড়ি যাইও বন্ধু বসতে দিবো পিড়া, জলপান করতে দেব শালি ধানের চিড়া, শালি ধানের চিড়ারে ভাই বিন্নি ধানের খই, বাড়ির গাছের সবরি কলা গামছা বান্ধা দই"—লোক ছড়ায় এমন ধান-বন্দনা এখনও অতীতে নিয়ে যায় আমাদের। এসব চালের সুস্বাদু পিঠা-পায়েস, খই-মুড়ি ও ভাতের গন্ধ এবং স্বাদ ছিল অসাধারণ।

প্রাচীনকাল থেকেই বাংলায় নানা জাতের ধানচাষ হয়ে আসছে। সংশ্লিষ্টদের তথ্য অনুযায়ী, এ দেশে ১৫ হাজার জাতের ধান আবাদ হত। ঐতিহ্যবাহী রাজভোগ, দুধরাজ, পঙ্খিরাজ এসব ধানের আলাদা-আলাদা বৈশিষ্ট্য ছিল। রাজভোগ ধানের চাল চিকন, বেশ লম্বা এবং ভাত ধবধবে সাদা। আবার দুধরাজ ধানের চাল ব্যবহার হত পিঠা-পায়েস তৈরিতে। পঙ্খিরাজ ধানের চাল খৈ, মুড়ি, চিঁড়া তৈরির জন্য ব্যবহার হত। অন্যদিকে ৮০ সালের দিকেও দেশের দক্ষিণাঞ্চলে বেশ কিছু আমন ধান চাষ হত যেগুলো পানির সঙ্গে বেড়ে উঠত। এগুলোর মধ্যে রয়েছে দলকচু, খুইয়েমটর, শ্রীবালাম। আবার নদী বা খালের তীরবর্তী নিম্নভূমিতে চাষ হত জলি বা জাগলি ধান। জমিতে জল-ভর্তি অবস্থায় রোপন এবং জলেতেই কাটা হত যার ফলে এর নাম করা হয় 'জলি ধান'। একেবারে বিলুপ্তি ঘটেছে এ জলি ধানের।

চাঁপাই নবাবগঞ্জের ঐতিহ্য সুগন্ধি 'রাঁধুনী-পাগল'। অনেক আগে বরেন্দ্র অঞ্চলে এ ধানের চাষ হত। কিন্তু উচ্চফলনশীল ধানের প্রচলনে অনেকটা হারিয়ে যায় দেশি জাতের এ ধানটি। প্রবীণ চাষীরা জানান, এ ধানের চালের ভাত রান্নার সময় এর সুগন্ধে পাশে বসে থাকা রাঁধুনীর পাগল হওয়ার উপক্রম হয়। রাঁধুনীদের তাই খুব পছন্দের ধান এটি। গ্রামের এক বাড়িতে রান্না করা হলে আশেপাশের বাড়ি থেকেও এর সুগন্ধ পাওয়া যায়। ভাত খেতেও অত্যন্ত সুস্বাদু।

নেত্রকোনায় বসবাসকারী হাজং, গারো, রাংসা, সাংমা, মান্দা, দারিং ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর লোকেরা দলবদ্ধভাবে বিন্নি ধান চাষাবাদ করে থাকেন। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এ ধানের আবাদ কমতে শুরু করেছে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে বিন্নি ধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কাজে বিন্নি ধান অপরিহার্য।

দিনাজপুরের ঐতিহ্যবাহী কাটারিভোগ। মসজিদে মসজিদে মিলাদ ও ঘরে ঘরে লক্ষ্মীনারায়ণ পূজার মাধ্যমে নবান্নের উৎসবের সূচনায় কাটারিভোগের চাল ব্যবহার হত। স্বাদ ও গন্ধে অতুলনীয় এ চাল ছুরি যেমন মাথার দিকে চোখা ও একটুখানি বাঁকা, কাটারিভোগ ধানও দেখতে ঠিক তেমনি এবং সুগন্ধী। কথিত আছে, এই উন্নত ধানের চাল দিয়ে দেবতাকে ভোগ দেয়া হত বলেই এর নামকরণ করা হয়েছে 'কাটারিভোগ'। উপঢৌকন হীরা, পান্না, স্বর্ণ মুদ্রা পেয়ে তৎকালীন সম্রাট যত না খুশি হতেন, তার চেয়ে বেশি খুশি হতেন কাটারিভোগ চাল পেয়ে।

বরিশালের বানারিপাড়ার দেড়শো বছরের ঐতিহ্যবাহী বালামের ব্যবসা জৌলুস হারিয়েছে। অথচ একসময় বানারিপাড়ার বালাম চালের সুখ্যাতি ছিল দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বহির্বিশ্বেও। বানারিপাড়ার মলঙ্গা, নলেশ্রী ও ব্রাহ্মণকণ্ঠী গ্রাম বালাম চালের জন্য বিখ্যাত ছিল। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে চাল-ব্যবসায়ীরা বানারিপাড়ায় এসে চাল ক্রয় করে তাঁদের এলাকায় নিয়ে যেতেন। বালামের স্থানীয় জাতের মধ্যে সীতাভোগ, জয়না, নলডোক, রূপের শাইল, লোতরমোটা, কুরিয়ারগালী, কুরিশাইল, কাজল শাইল, রাজশাইল, কুটি আগনি, বেতিচিকন, কেয়া মৌ, কেরাঙ্গাল, বাঁশফুল, ডিঙ্গামনি ও লক্ষ্মীবিলাস। সচ্ছল ও শৌখিন কৃষকেরা নিজেদের খাওয়া বা অতিথি আপ্যায়নের জন্য এখনো অল্প পরিমাণে বালাম ধান চাষ করেন। বরিশাল, বরগুনা, পটুয়াখালী, ঝালকাঠি এবং পিরোজপুর জেলায় এক সময় বালাম ধানের চাষ হত। পটুয়াখালীর উপকূলের বাঁধের বাইরে যেসব জমিতে এখনো জোয়ার-ভাঁটা হয় সেখানে বালাম ধানের আবাদ হয়। হাওরাঞ্চলে সুস্বাদু ও সুগন্ধী কাব্যিক ধান —'ঝরাবাদল, বাঁশফুল, বর্ণজিরা, তুলসীমালা, গাজী, জোয়ালকোট, মধুমাধব, খাসিয়া বিন্নি, হলিনদামেথি, দুধজ্বর' —স্থানীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যেরও প্রতিনিধিত্বের পরিচয়বাহী। এসবের অধিকাংশ আর দেখা যায় না।

এভাবে দেশের প্রতিটি জেলা উপজেলার গ্রামগুলোতে ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের ধানের আবাদ হত। কিন্তু এসব ধান উৎপাদনের সঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধির তাল মেলাতে না পেরেই গবেষণার মাধ্যমে অধিক উৎপাদনশীল ধানের দিকে ঝুঁকছে দেশ ও দেশের কৃষকেরা। আর এ কারণেই হারিয়ে গেল হাজার প্রকারের ঐতিহ্যবাহী ধান!

দেশের বিভিন্ন স্থানে আবাদ হত গৌরীকাজল, নোড়াই সাটো,

পরাঙ্গি দীঘা, হাসবুয়ালে, ভোরানটা, মানিকদীঘা, খৈয়ামটর, দলকচু, পঙ্খিরাজ, বাঁশিরাজ, ঝিঙেঝাল, দেবমনি, দুধমনি, কালাবায়রা, ধলাবায়রা, গন্ধকোস্তের, আশ্বিন দীঘা, আশ্বিন মালভোগ, দুধকলম, বানাজিরা, সাধু টেপি, রংগিলা, নলবিরণ, সোনা রাতা, লতাবোরো, লতাটেপি, চন্দী, বাঁশফুল, তুলসীমালা, ঠাকরি, লালটেপি, বিকিন, গজারি, বর্ণজিরা, কচুশাইল, অসিম, বিদিন, ফটকা, কাউলি, দুধজ্বর, বাজলা, বিরল, আশা, গাজী, কইতাখামা, জোয়ালকোট, মাতিয়ারি, ময়নাশাইল, গোয়াই, মুগবাদল, চেংরামুরি, ময়নামতি, পুঁথিবিরণ, ঝরাবাদল, মধুবিরণ, মধুমাধব, ফুলমালতি, কলারাজা, খাসিয়া বিন্নি, গান্ধিশাইল, সোনাঝুরি, হাতকড়া, ঘোটক, চাপরাস, ঠাকুরভোগ, মুরালি, দুমাই, বগি। এগুলো এখন খুব কম পরিমাণ জমিতে আবাদ হয়।

আউশ, রোপা আমন এবং বোনা আমন প্রজাতির এসব ধানের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে — অঅড়াই, চেংড়ি, বাউরস, নাজিমুদ্দিন, লাটিসাইল, বালাম, ভুতুবালাম, মুরালী, কাতিছানি, নিহি, খৈসা, পশুআইল, ছিরমউন, পাখবিরনী ও দুধকাতারিসহ। কয়েক হাজার প্রজাতির ধান ছিল যেগুলোর নাম বিস্মৃতির আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে।

বাংলাদেশে বিভিন্নস্থানে কালিজিরা, বাসমতি, গোবিন্দভোগ, বাদশাভোগ, খাসকানি, রাঁধুনী পাগল, রানিস্যালুট, চিনিগুঁড়াসহ হাজার রকমের ধানের জাত সামান্য পরিমাণ জমিতে আবাদ হয়।

ধানের পুরনো কথা : রায়েদা জাতের ধান জংলি আমন নামে পরিচিত ছিল। বীজে কোনো সুপ্তিকাল ছিল না। বীজ বুনলেই চারা গজিয়ে যেত। জংলি ধান বাইশ-বিশ, গাবুরা, বাজাইল, দীঘা প্রভৃতি ধান চাষী বাছাই করে জাত তৈরি করে নেয়। রায়েদা থেকে বাছাই করা হয় বুনো আমনের অন্যান্য জাতগুলো। বোনা আমনের জাতগুলোর মধ্যে যেগুলো বন্যা সহ্য করতে পারত না, সেগুলো বাছাই করে রোপা আমন জাত তৈরি করা হয়। গভীর পানির ধান কালো আমন ও লক্ষ্মীদীঘা। এ জাত থেকে জোয়ালভাঙ্গা, বাদল, কার্তিকা প্রভৃতি জাতের উদ্ভব হয়। পরবর্তীতে তিলক কাচারি ধানের জাতের উদ্ভব হয়। এ তিলক কাচারি থেকে আশ্বিনা বা ভাদুইয়া এবং পরবর্তীতে শাইল ধানের জাতের আবিষ্কার হয়। এ থেকে ইন্দ শাইল, দুধসরা, ঝিঙ্গাশাইল, দাদখানি বা কাটারিভোগ ধানের উদ্ভব হয়। নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে কালিজিরা, চিনিগুঁড়া, বাদশাভোগ কাশকাখি ও রাঁধুনী-পাগল প্রভৃতি সুগন্ধি পোলাও-এর চালের উদ্ভব ঘটে। ভাদুইয়া বা আশ্বিনা জাতের ধানগুলো থেকে সৃষ্টি হয় আউশের জাতসমূহ। আউশ ধানের জীবনকাল কম, শাইল বা রোপা আমনের জীবনকাল বেশি। শীষ বের হয়ে ফুল ফোটার সময় দিনের দৈর্ঘ্য কম হতে হবে। এ জন্য রোপা আমনকে বলা হয় আলোক সংবেদনশীল। আর আউশের জাতসমূহ অলোক সংবেদনহীন। রায়েদা জাতের যে সব ধানের বৈশাখ মাসে শীষ বের হত, তা থেকে বোরো ধানের উৎপত্তি হয়। ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে চাষীরা তাঁদের চাহিদা মাফিক হাজার হাজার জাতের ধানের জাত উদ্ভাবন করেন। ১৯৩০ সালের এক জরিপ থেকে জানা যায়, অবিভক্ত বাংলায় সে সময় প্রায় ১৫ হাজার জাতের ধান ছিল।

হারিয়ে যাবার কারণ: প্রাচীনতম দেশীয় জাতের এসব ধানচাষ অপেক্ষাকৃত কম লাভজনক। ফলে গবেষণালব্ধ উচ্চফলনশীল (উফশী) জাতের ধানচাষ বেশি লাভজনক হওয়ায় সে দিকে ঝুঁকে পড়েছেন কৃষকেরা। যে কারণে দেশ থেকে ক্রমেই বিলুপ্তি হয়ে যাচ্ছে প্রকৃতিবান্ধব এ সব ধান।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী ১৯৫০-৫১ সালে চালের মোট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৬২ লাখ টন। বীজ ও অপচয় বাবদ শতকরা ১০ ভাগ বাদ দেওয়ার পর চালের নেট প্রাপ্যতা ছিল ৫৫ লাখ ৮০ হাজার টন। লোকসংখ্যা ছিল ৪ কোটি ২১ লাখ। দৈনিক মাথাপিছু ৪৫৪ গ্রাম হিসাবে খাদ্যশস্যের চাহিদা ছিল ৬৭ লাখ ৩০ হাজার টন। ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৭৫ দেশে চালের উৎপাদনের বার্ষিক পরিমাণ ছিল এক কোটি ৭ লাখ টন। ত্রিশ বছর পর গত আর্থ বছরে (২০১১-২০১২) দেশে চালের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ৩৫ লাখ ৪১ হাজার ১০১ টন। ১৯৫১ থেকে ২০১২ সাল। ৬১ বছরের ব্যবধানে চালের উৎপাদন বেড়েছে ২ কোটি ৭৩ লাখ ৪১ হাজার ১০১ টন। অথচ আবাদি জমির পরিমাণ প্রতি বছরই কমছে!

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষকেরা বলেছেন, যদি স্থানীয় জাত আবাদ হত তাহলে ৩ কোটি ৩৫ লাখ টন চাল উৎপাদন করা যেত না। দেশীয় জাতের ধান আবাদ থেকে উফশী ধানচাষে ফলন বেশি এবং লাভজনক। দেশি জাতগুলো বিলুপ্তির প্রধান কারণ হচ্ছে উৎপাদন স্বল্পতা। আগে দেশি জাতের ধানের বিঘা প্রতি ফলন হত ৪-৫ মণ। বিগত শতকের ষাটের দশকে উচ্চফলনশীল জাতের ধান উদ্ভাবন শুরু হয়। এ সকল জাতের ধানের বিঘা প্রতি ফলন ২০-২২ মণ হতে থাকে। আর চাষী দেশি জাতগুলো ছেড়ে উচ্চফলনশীল জাতে ধানচাষে ঝুঁকে পড়তে থাকেন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বাড়ি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, রাস্তাঘাট তৈরিসহ নানাবিধ কারণে আবাদি জমি কমে যাচ্ছে। এ কারণে চাষী একই জমিতে অধিক ফসলের চাষে ঝুঁকছেন। আগের দিনে এক জমিতে বছরে একটি ফসল ফলত। একবার মাত্র ধান ফলানো যেত। এখন বছরে দুবার ধানচাষ করা যায়। কোনো কোনো জমিতে তিনবার ধানচাষ হচ্ছে। চাষী খুঁজছেন স্বল্প জীবনকালের জাত। যাতে আমন কাটার পর একই জমিতে বোরো চাষ করা যায়। সে জমিতে মাঝখানে আউশ এবং আউশ কেটে রোপা আমন চাষ করা যায়।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মোঃ সাইদুল ইসলাম বলেন, এই প্রতিষ্ঠানের জিন ব্যাঙ্কে ৮ হাজার প্রজাতির ধান সংগ্রহে আছে। এর মধ্যে ৬ হাজার দেশি জাতের এবং ২ হাজার বিদেশি জাতের। এসকল জাতের সঙ্গে সংকরায়ণ ঘটিয়ে উচ্চফলনশীল জাতগুলো উদ্ভাবন করা হচ্ছে। তিনি জানান, এ পর্যন্ত উচ্চফলনশীল ৬১টি এবং ৪টি হাইব্রিড জাত অবমুক্ত করা হয়েছে। এ সব জাতের সবগুলো জাত এখন চাষ হয় না। ৮০-র দশকে উদ্ভাবিত বি আর-১০ ও বি আর-১১ জাত দুটি দীর্ঘদিন ধরে চাষ হচ্ছে। বি আর-২৮ ও বি আর-২৯ জাত চাষীদের কাছে খুবই জনপ্রিয়। দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বি আর-২৯ জাত ধান উৎপাদনকারী দেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছে।

কৃষি গবেষকেরা বলছেন, পুরনো ধানগুলোর মধ্যে খরাসহিষ্ণু, বন্যা-প্রতিরোধী কিংবা লবণাক্ততা প্রতিরোধী ধানও থাকবে। আমাদের দরকার হবে ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার সমন্বয়। হাজার জাতের ধানের বৈচিত্র্যের জিনগত কারণ খুঁজে বের করা। আমাদের ঐতিহ্যবাহী অনেক ধান এখন জয়দেবপুরসহ বিভিন্ন স্থানে সংরক্ষিত রয়েছে। একটু উদ্যোগ নিলেই হয়ত এগুলো আবার মাঠে ফিরিয়ে নিতে পারব। বাংলাদেশের কমবেশি ৮৭ হাজার গ্রামের প্রতি ৭-৮টি গ্রামে যদি এক জাতের ধান চাষ করা হয়, তা হলেই আমরা ১০ হাজার জাতের ধানকে টিকিয়ে রাখতে পারব। কাজটা মোটেই কঠিন নয়। ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী ড. খালেকুজ্জামান বলেন, ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের জিন ব্যাঙ্কে যে জাতগুলো রয়েছে এগুলো ব্যবহার করে নতুন জাতের ধান উদ্ভাবন করা হচ্ছে। গবেষণার জন্যই জিন ব্যাঙ্কে জাতগুলো সংরক্ষণ করা হয়েছে।

রিপোর্ট তৈরিতে সহযোগিতা করেছেন ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি বিমল সাহা, লিটন বাশার ও মতিউর রহমান।

দৈনিক ইত্তেফাক থেকে নেওয়া

উমা

বাণিজ্যিক নয় মানবিক
স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক পত্রিকা।

প্রাপ্তিস্থান : পাতিরাম, বুকমার্ক, পিপল্‌স বুক সোসাইটি, বই-চিত্র, অম্লান দত্ত বুক স্টল (বিধাননগর পুরসভা), শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র (চেঙ্গাইল), ডাঃ শুভজিত ভট্টাচার্য (উযুমপুর মিনিবাস স্ট্যান্ডের কাছে, আগরপাড়া)। শেয়ালদা মেন সেকশনের বিভিন্ন বইয়ের স্টল। পাঠক এবং এজেন্টদের যোগাযোগ করার ফোন নম্বর : ৯৮৪০৯-২২১৯৪ বা ৯৩৩১০-১২৬৩৭।

মাননীয় সম্পাদক,
উৎস মানুষ

আপনার এপ্রিল-জুন ২০১৩ সংখ্যায় প্রকাশিত ষড়ানন পন্ডা মশাইয়ের লেখা 'বিজ্ঞান আছে জ্ঞানই যা নেই'— সম্পর্কে দু-একটি কথা বলার জন্য এই চিঠি।

পুরুলিয়ার একটি কলেজে বিজ্ঞান পড়ানোর সূত্রে এবং সেখানকার ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলার সূত্রে আমার কিছু ধারণা জন্মেছে। পুরুলিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা স্বাধীনতার ষাট বছর বাদেও বিশেষ উন্নতি হয় নি। অনেক ছাত্রছাত্রীই দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য— যে দুটো মানবজাতির বিকাশের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার, সেটা থেকে পুরুলিয়ার অনেক মানুষই বঞ্চিত। কিন্তু তথাকথিত পুঁথিগত বিদ্যার অধিকারী না হয়েও তারা যে ধরনের মুক্ত জ্ঞানের ও মনের অধিকারী, সেটা বোধহয় ষড়াননবাবুরও জানা আছে। হাসপাতাল বা প্রাইমারি হেল্‌থ সেন্টার থাকলেও, ডাক্তারবাবুরা কলকাতা বা তার ধারেপাশে থাকার দরুন এবং সপ্তাহে -দু'সপ্তাহে একবার আসা বা একেবারেই না আসার কারণে অধিকাংশ অধিবাসীই স্থানীয় হাতুড়ে বা অন্য ধরনের চিকিৎসার ওপর নির্ভর করতে হয় (যাকে আমরা তথাকথিত জড়ি-বুটির চিকিৎসা বলি)। আমরা যারা বাইরে থেকে যাতায়াত করি তারাও চেষ্টা করি ওখান থেকে তাড়াতাড়ি চলে আসার। প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষেরা চর্চার অভাবে কিছুদিন পরে নিরক্ষরে পরিণত হন। কাজেই বিজ্ঞান শিক্ষায় যে গুটিকয়েক ছাত্র শিক্ষিত হন তাঁরা যে জনবিজ্ঞান আন্দোলনে অংশ নেবেন এবং সবাইকে সচেতন, করবেন এই আশা বোধহয় দুরাশা। সমস্যা শুধু যে পুরুলিয়াতে সীমাবদ্ধ এটা ভাবার কোনো কারণ নেই। এই সমস্যা কম-বেশি সব জায়গাতেই আছে। আমরা যারা স্নাতক হই, কতজন আমাদের অধীত বিদ্যা কাজে লাগাই? একজন গণিতে স্নাতকোত্তর ব্যক্তিকে দেখা যায় ব্যাঙ্কের কেরানিগিরি করতে। বিজ্ঞানমনস্ক হতে গেলে যে বিজ্ঞান শিখতে হবে সেটা ভাবার কোনো কারণ নেই। বাবা-মার মৃত্যুর পর মুণ্ডিত মস্তক না হলেই যে নিজে প্রগতিশীল, এটা ভাবার কোনো যুক্তি আছে কি? আমরা প্রতিদিনই হয়ত এমন অনেক কাজ করি অচেতনভাবে যা হয়ত সংস্কারের ধারেপাশেই থাকে। ধর্ম মানুষের স্বাভাবিক বিশ্বাস। যেখানে সার্বিক হতাশা কাউকে ভেঙে ফেলতে চায়, তখনই সে হয়ত ধর্মবিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরতে চায়। শুধু বিজ্ঞানমেলা, সেমিনার ইত্যাদির মাধ্যমে কাউকে বিজ্ঞানমনস্ক করা খুব দুরূহ কাজ, জনবলেরও প্রয়োজন। দরকার সার্বিক শিক্ষার।

প্রদীপ্ত গুপ্তরায়

সংগঠন সংবাদ

রাধানাথ-স্মরণ

● রাধানাথ শিকদারের দ্বিশত জন্মবর্ষ উপলক্ষে তাঁকে স্মরণ করল সল্টলেকের ক্যালকাটা ম্যাথামেটিক্যাল সোসাইটি। এম সি চাকী সেন্টার ফড ম্যাথামেটিক্যাল সায়েন্সেস-এ রাধানাথের জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা করেন সঞ্জয় সেন, আর কে রায়চৌধুরি, এ জি দাস, বি চাকী, সীতাংশ মুখার্জি প্রমুখ। দ্বিতীয় পর্যায়ে বক্তা ছিলেন আশীষ লাহিড়ী, সঞ্জয় সেন, দীপক দাঁ, কুনাল ঘোষ, আশিস গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ।

● পঞ্চম 'দুলালচন্দ্র সুর স্মৃতি' বক্তৃতার আয়োজন করে রবীন্দ্রভবনের জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সভাগৃহে ২৪ শে মার্চ, ২০১৩-য়। আলোচনার বিষয় ছিল 'যুক্তির আলোকে বিবেকানন্দ'। বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও গবেষক আশীষ লাহিড়ী। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সংস্থার সভাপতি ভাস্করানন্দ সুর। আলোচনা শুরুর আগে ছিল সুতপা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান এবং নারায়ণ দাসের মূকাভিনয়, বিষয়—বেকারত্ব। আশীষবাবু তাঁর ভাষণে বলেন, বিবেকানন্দ একজন সাধারণ মানুষ ছিলেন না। বিশেষত কোনো তত্ত্ব পড়ার পর তা থেকে মূল বিষয়টা গ্রহণ করার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তাঁর। তবে অসাধারণ মানুষ বলেই তাঁর কোনোরকম সমালোচনা না করে কেবলই শ্রদ্ধা সহকারে পূজা করতে হবে এটাও কাম্য নয়। কারণ এতে মানুষের মুক্তচিন্তা রুদ্ধ হয় যা কোনো সুস্থ সমাজকে ভঙ্গুর করে। এরপর তিনি তথ্য ও বিশ্লেষণের আলোয় বিবেকানন্দকে দেখানোর চেষ্টা করেন। শেষে দারুণ জমে উঠেছিল প্রশ্নোত্তর পর্ব। সভাপতিত্ব করেন বিজ্ঞানকর্মী বিবর্তন ভট্টাচার্য। সংস্থার সভাপতি ভাস্করানন্দ সুর সকলকে ধন্যবাদ জানান।

উৎস মানুষ পত্রিকার গ্রাহক হবার নিয়ম

বছরে ৪টি সংখ্যা বেরোয়, ৩ মাস অন্তর। চাঁদা বছরে ১০০ টাকা। বছরের যে কোনও সময় গ্রাহক হওয়া যায়। **UBI**-এর যে কোনো শাখায় টাকা জমা দিন অথবা অন্য যে কোনও ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা জমা দিন **UBI** কলেজ স্ট্রীট শাখায়। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ নীচে দেওয়া হল—

United Bank of India, College Street Branch,
Kolkata - 700073.
Utsa Manush,
SB Account No. 0083010748838।
IFSC No. UTBIOCOL108

ফোন করে কিংবা ই-মেল করে আপনার ঠিকানা (পিনকোড ও ফোন নং সহ) এবং কোন মাস থেকে গ্রাহক হলেন অবশ্যই জানিয়ে দেবেন। বইমেলার স্টলে গ্রাহক করা হয়। গ্রাহক নবীকরণ একইভাবে করা হয়। ডাকে পত্রিকা পাঠানো হবে।

উৎস মানুষ পুস্তক তালিকা

● বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ (৫ম প্রকাশ) সংকলন	৪২.০০
● প্রেসিডেন্ট বুশ-এর এই যুদ্ধ অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত	৩০.০০
● তিন অবহেলিত জ্যোতিষ্ক (১ম) রণতোষ চক্রবর্তী	১৮.০০
● বাংলা বন্ধ বা শেষের শুরু হিমানীশ গোস্বামী	৪০.০০
● এটা কী ওটা কেন সংকলন	৫০.০০
● যে গল্পের শেষ নেই দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৫০.০০
● আয়ুর্বেদে বিজ্ঞান সংকলন	৫০.০০
● আরজ আলী মাতুব্বর ভবানীপ্রসাদ সাহু	২০.০০
● প্রতিরোধ: অন্ধতা ও অযুক্তির বিরুদ্ধে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত (৩য়)	৬০.০০
● বিবেকানন্দ অন্য চোখে/ সমীক্ষা ও আরো কিছু বিতর্ক	১০০.০০
● শেকল ভাঙা সংস্কৃতি	৬০.০০
● প্রমিথিউসের পথে	৩৫.০০

প্রাপ্তিস্থান: দীপক কুণ্ডু, ২৯/ ৩, শ্রী গোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা-১২, বই-চিত্র (কফি হাউসের তিন তলা), পাতিরাম, বুক মার্ক, অমর কোলে (বিবাদী বাগ), দিলীপ মজুমদার (ডেকার্স লেন), সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়), সৈকত প্রকাশন (আগরতলা), র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন (বেনিয়াটোলা লেন, কলেজ স্ট্রীট), মনীষা গ্রন্থালয় (কলেজ স্ট্রীট)। বইকল্প, ১৮ বি, গড়িয়াহাট রোড (সাউথ), কলকাতা-৭০০০৩১। জ্ঞানের আলো (যাদবপুর কফিহাউসের উল্টোদিকে)। থীমা, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা -৭০০০২৬।